বাংলাদেশের কৃষি

ইউনিট ১

ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ মানুষ তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। শুধু মানুষ নয়, সমস্ত গবাদি পশুর খাদ্য আসে কৃষি থেকে। জাতীয় আয়ের প্রায় ১৬ ভাগ আসে কৃষি থেকে। দেশের বৃহত্তর শিল্পগুলোও কৃষির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। ফসল, গবাদি পশু, পোল্ট্রি, মৎস্য ও বনরাজি ইত্যাদি ক্ষেত্র নিয়ে বিস্তৃত বাংলাদেশের কৃষি। কৃষি তথ্য ও সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, এনজিও এবং বিভিন্ন কৃষি উপকরন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এছাড়াও কৃষি তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির উৎস হিসেবে অভিজ্ঞ কৃষক/কৃষানী, কৃষক সভা, উঠোন বৈঠক এবং কৃষক বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতীয় জীবনে সামাজিক পরিবর্তন ও সর্ববিধ উন্নতির মূলে কৃষি উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আমাদের কৃষির সার্বিক সমস্যা সমাধান করে সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এ ইউনিটে বাংলাদেশের কৃষির ক্ষেত্রসমূহ, সামাজিক বনায়ন, কৃষি তথ্য সেবা প্রাপ্তিতে কৃষক, বিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট, ই-কৃষি ইন্টারনেট, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি তথ্য সার্ভিস ও কৃষি সম্প্রসারণ, এনজিও ও কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ -১.১ : বাংলাদেশে কৃষির ক্ষেত্র

পাঠ -১.২ : কৃষির ক্ষেত্র : মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসল, সামাজিক বনায়ন

পাঠ -১.৩ : কৃষির ক্ষেত্র : মৎস্য, গবাদি পশু, পোল্ট্রি

পাঠ -১.৪ : বাংলাদেশের কৃষি তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির উৎস : কৃষক, বিদ্যালয়, ইন্টারনেট ও ই-কৃষি

পাঠ -১.৫ : বাংলাদেশের কৃষি তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির উৎস : উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান

পাঠ -১.৬ : কৃষির তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির উৎস : কৃষি সম্প্রসারণ, এনজিও, কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।

পাঠ -১.৭ : ব্যবহারিক: বিভিন্ন প্রকার খামার (মাঠ/উদ্যান/মৎস্য/গবাদিপশু/পোল্ট্রি) পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন।

ক) বাণিজ্যিক ডেইরি (গবাদি পশু) খামার পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন।

খ) পোল্ট্রি খামার পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন।

পাঠ-১.৮ : ব্যবহারিক : নিকটবর্তী একটি কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

পাঠ-১.১ বাংলাদেশের কৃষির ক্ষেত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষি কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন;
- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কৃষির গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- কৃষির উপাদানগুলো কী তা জানতে পারবেন;
- কৃষির ক্ষেত্রসমূহ জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কৃষি, কৃষির ক্ষেত্রসমূহ, কৃষির গুরুত্ব, কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা।

কৃষি

মূলত, কৃষি বলতে ফসল উৎপাদনের উদ্দেশ্যে জমির চাষাবাদকে বুঝায়। প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন, প্রতিরক্ষা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ এবং ফসলের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য জ্ঞানের ব্যবহারকে কৃষি বলে। কৃষির প্রধান উপাদান হল মাটি। অর্থাৎ মাটিকে ব্যবহার করে যে কোন উৎপাদনকে কৃষি বলে অবহিত করা যায়। যেমন:- মাছ চাষ। মাছ চাষের জন্য পুকুরের প্রয়োজন, আর পুকুরের গুণগত মান মাটির গুণগত মানের উপর নির্ভর করে। অতএব, মাছ চাষকেও কৃষি বলা যাবে। বিজ্ঞানের যে শাখায় কৃষির উৎপাদন প্রযুক্তি ও কৃষি বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়াদি জানা যায় তাকে কৃষি শিক্ষা বলে।

কৃষি বিপ্লবের বিভিন্ন ধাপ

আজকে কৃষি যে অবস্থায় আছে তা একসময় এমন ছিল না। কৃষি কয়েকটা ধাপ অতিক্রম করে আজকের অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। যেমন:

১। আদি ধাপ।
২। পশু শিকার ধাপ।
৩। আগুন ও লোহার হাতিয়ারের ব্যবহার ধাপ।
৪। পশুপালন ধাপ।
৫। ফসল উৎপাদন ধাপ
৬। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি।

কৃষির উপাদান

কৃষির প্রধান উপাদান হল মাটি। তাছাড়া আরোও অনেক উপাদান যা কৃষির উৎপাদনের সাথে জড়িত যেমন: পানি, তাপমাত্রা, আপেক্ষিক আর্দ্রতা ইত্যাদি কৃষি উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। অতএব বিজ্ঞানের যে শাখায় কৃষির উৎপাদন প্রযুক্তি ও কৃষি বিষয় সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াদি জানা যায় তাকে কৃষি শিক্ষা বলে।

কৃষির গুরুত্ব

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি কর্মকান্ডকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে দেশজ অর্থনীতি। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মুল উপাদান হল কৃষি। দেশের প্রায় শতকরা ৭০-৮০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে এবং তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে যুক্ত। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ছিল শতকরা ১৫.৩৩ ভাগ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬)। দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা প্রায় ৪৭ ভাগ সরাসরি এবং ৮০ ভাগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি খাতে নিয়োজিত। দেশের মোট রপ্তানিতে কৃষি জাত পণ্য যেমন- কাঁচাপাট, পাটজাত দ্রব্য, চিংড়ি চামড়া ও চা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নিচে বাংলাদেশের কৃষির গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

মৌলিক চাহিদা পূরণ

মানুষের মৌলিক চাহিদা বলতে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, ও শিক্ষাকে বুঝায়। এছাড়াও অন্যান্য চাহিদার মধ্যে রয়েছে আসবাবপত্র, জ্বালানি, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি। এসব চাহিদা পূরণে কৃষি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে মৌলিক চাহিদা পূরণে কৃষির ভূমিকা আলোচনা করা হল।

১. খাদ্য: মানুষের প্রথম মৌলিক চাহিদা হল খাদ্য। আর খাদ্যের জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে কৃষির উপর নির্ভরশীল। খাদ্যের বেশিরভাগ আসে কৃষি হতে। যেমন চাল, ডাল, গম, ভুট্টা, মাছ, শাকসবজি, মাংস ইত্যাদি। সুতরাং আমরা বেঁচে থাকার জন্য সম্পূর্ণরূপে কৃষির উপর নির্ভরশীল।

২. বস্ত্র: বস্ত্র মানুষের দ্বিতীয় মৌলিক চাহিদা। লজ্জা ও শীত নিবারণের জন্য মানুষ বস্ত্র পরিধান করে। বস্ত্র তৈরি মুল উপাদান বা কাঁচামাল সুতা আসে কৃষি হতে। যেমন, পাট, তুলা, রেশম ইত্যাদি।

৩. বাসস্থান: মানুষের তৃতীয় মৌলিক চাহিদা হল বাসস্থান। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে হলে সর্ব প্রথম তার একটা স্থায়ী বাসস্থান দরকার। আর বাসস্থান তৈরির প্রধান উপকরণ যেমন বাঁশ, কাঠ, ছন, খড় ইত্যাদি আসে কৃষি খাত হতে।

৪. ঔষধ: আদিকাল হতেই বিভিন্ন উদ্ভিদ বিভিন্ন রোগের ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ঔষধ তৈরির বেশিরভাগ কাঁচামাল হচ্ছে কৃষিজাত পণ্য। যেমন: পেনিসিলিন নামক জীবন রক্ষাকারী ঔষধ পেনিসিলিয়াম নামক ছত্রাক হতে তৈরি হয়।

৫. জ্বালানি: গ্রামে অধিকাংশ মানুষ জ্বালানি হিসাবে লাকড়ি, লতাপাতা, বাঁশ ইত্যাদি ব্যবহার করে। এছাড়া গোবর, খড়, পাটকাঠি গ্রামাঞ্চলের জ্বালানির একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র শিল্পে জ্বালানি হিসাবে কাঠের লাকড়ি ব্যবহার করা হয়। যেমন বেকারী শিল্প।

৬. আসবাবপত্র: আমাদের বাসস্থানের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র প্রয়োজন হয়। যেমন-খাট, আলনা, চেয়ার, টেবিল, আলমারি, দরজা, জানালা ইত্যাদি। এগুলো বেশিরভাগই তৈরি হয় কাঠ ও বাঁশ দিয়ে।

৭. শিক্ষা: শিক্ষার প্রধান উপকরণ হল কাগজ। আর এই কাগজ তৈরি হয় বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য থেকে। যেমন-বাঁশ, আখের ছোবড়া ইত্যাদি। এছাড়া শিক্ষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল পেন্সিল। পেন্সিল তৈরিতে কাঠ ব্যবহৃত হয়। অতএব শিক্ষাও কৃষির উপর নির্ভরশীল।

৮. চিত্তবিনোদন: একজন মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন আছে। বন ও শিশু পার্কে লাগানো বিভিন্ন ধরনের ফুল ও সৌন্দর্যবর্ধক গাছগাছালি চিত্তবিনোদনের জন্য একটা ভাল মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। এই কারণে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল ও সুন্দরবন দেখতে যায়।

কর্মসংস্থান

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ তাদের কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। নিচে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

১. বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেকের বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস কৃষিকাজ।

২. দেশের প্রায় ৪৭% শ্রমিক কৃষিকাজে নিয়োজিত (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬)।

৩. দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০-৮০% লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল।

৪. কৃষিপণ্য নির্ভর বিভিন্ন শিল্প কারখানায় অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়ে থাকে।

৫. আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। আর এক্ষেত্রে কৃষির বিভিন্ন শাখা যেমন গবাদি পশু পালন, ফুল ফল চাষ, মুরগি পালন, মাছ চাষ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ আত্মকর্মসংস্থানের জন্য কৃষির ভূমিকা অনস্বিকার্য।

৬. দক্ষ ও অদক্ষ উভয় প্রকার শ্রমিকের কর্মসংস্থানের উৎস হল কৃষি।

শিল্প ও বাণিজ্য

শিল্পক্ষেত্রে কৃষির বহুমুখী ব্যবহার আছে। নিচে তা আলোচনা করা হল।

১. বাংলাদেশের অনেক শিল্পের কাঁচামাল আসে কৃষিজাত পণ্য হতে। যেমন পাট, চা, বস্ত্র, কাগজ, চিনি, চামড়া, খাদ্য ইত্যাদি।
২. শিল্পজাত কৃষি পণ্য বেশি উৎপাদনের মাধ্যমে শিল্প কারখানার উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। ফলে শিল্পের তথা বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। ফলশ্রুতিতে বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে।
৩. কৃষিপণ্যের উপর নির্ভরশীল শিল্প কারখানার পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

অন্যান্য গুরুত্ব

মানব জীবনে কৃষির বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। নিচে সেগুলো বর্ণনা করা হল।

১. কৃষি পণ্যের উৎপাদনের সাথে কোন এলাকার যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
২. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কৃষির ভূমিকা অনস্বীকার্য।
৩. কৃষিজাতপণ্য রপ্তানি করার মাধ্যমে অন্যান্য দেশের সাথে একটা ভাল সম্পর্ক তৈরি হয় যা একটা দেশের উন্নতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হতে সহজেই বুঝা যায় যে, মানব জীবনে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম।

সারনি ১: জিডিপিতে কৃষির বিভিন্ন খাতের অবদান

খাত	জিডিপিতে কৃষির বিভিন্ন খাতের অবদান (%)		
	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬
১. কৃষি ও বনজ	১২.৮১	১২.৩২	১১.৬৮
ক. শস্য ও শাকসবজি	৯.২৮	৮.৮৭	৮.৩২
খ. প্রাণি সম্পদ	১.৭৮	১.৭৩	১.৬৬
গ. বনজ সম্পদ	১.৭৪	১.৭২	১.৬৯
২. মৎস্য সম্পদ	৩.৬৯	৩.৬৯	৩.৬৫
মোট	১৬.৫	১৬.০১	১৫.৩৩

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬

কৃষির ক্ষেত্রসমূহ (Sectors of Agriculture)

ফসল, পশু পাখি, বন ও মাছ প্রভৃতি কৃষির প্রধান ক্ষেত্র। এসব বিষয়সমূহ একে অপরের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। এসব বিষয় একত্রে কোন এলাকার সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলে। অর্থাৎ কৃষি শিক্ষার জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ফসল, পশুপাখি, বন, মাছ প্রভৃতি চাষাবাদে আধুনিক কলাকৌশল সম্পর্কে জানা যাবে।
নিম্নে বাংলাদেশের কৃষির ক্ষেত্রসমূহের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল।

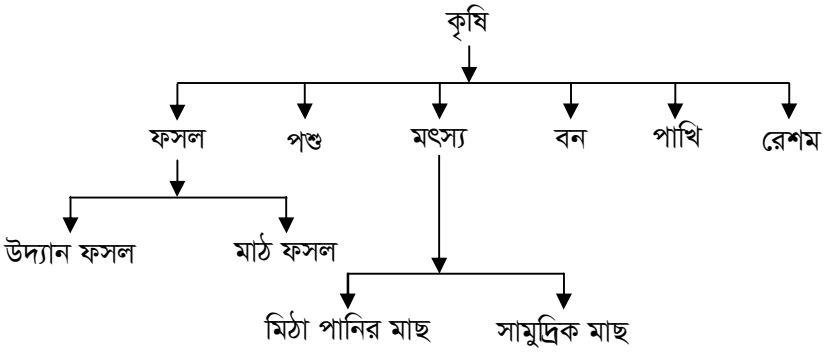

চিত্র ১.১.১ : বাংলাদেশের কৃষির ক্ষেত্রসমূহ

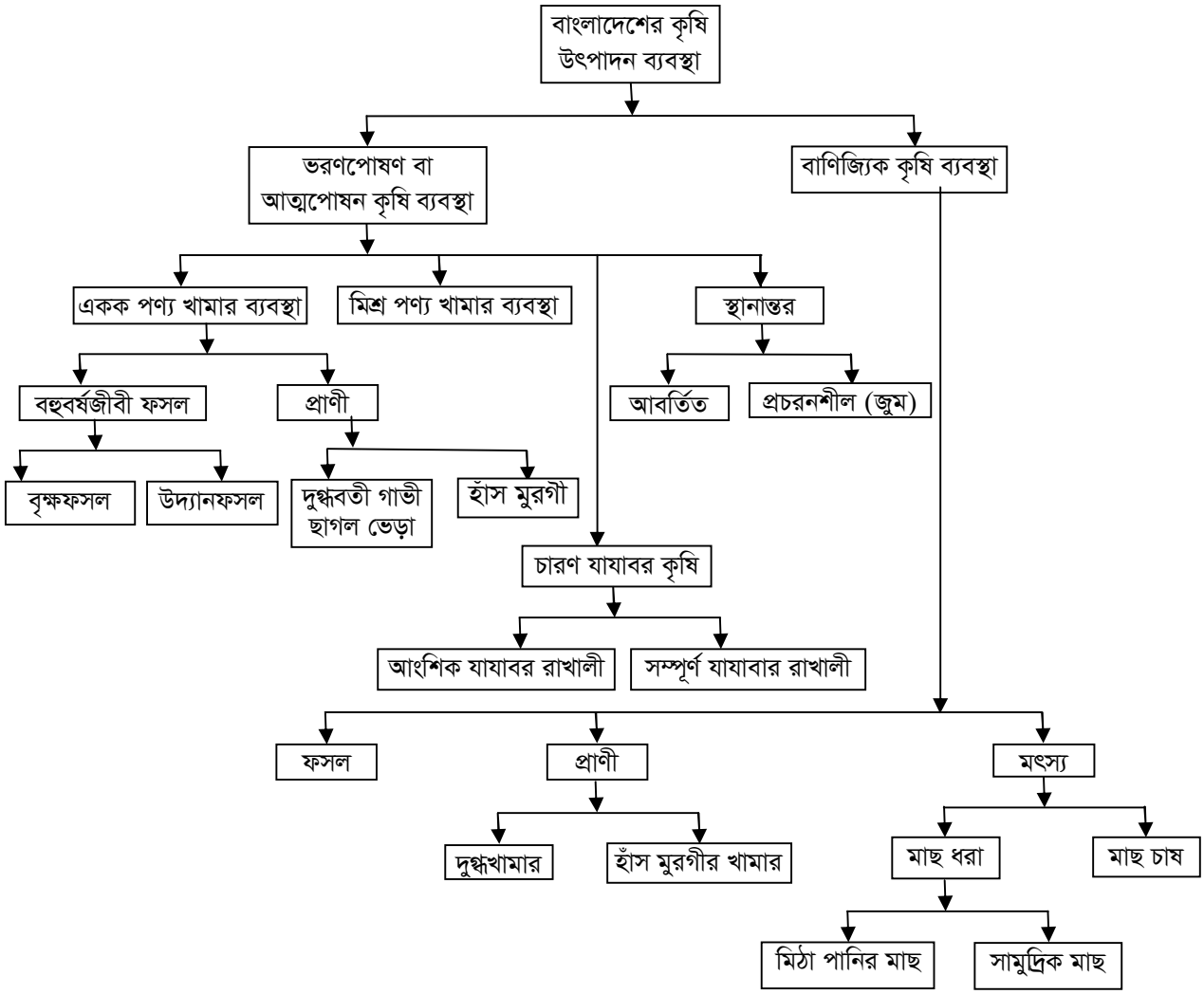

চিত্র ১.১.২ : বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা (হোসেন প্রমূখ, ১৯৯৩)

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কৃষির গুরুত্ব ও এর ক্ষেত্রসমূহ শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করবে

সারাংশ

কৃষি বলতে ফসল উৎপাদনের উদ্দেশ্যে অর্থসামাজিক উন্নয়নের মুল উপাদান হল কৃষি। ফসল, পশু পাখি, বন ও মাছ প্রভৃতি কৃষি শিক্ষার প্রধান পাঠ্য বিষয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মানুষের প্রথম মৌলিক চাহিদা কি?
ক) বস্ত্র খ) খাদ্য
গ) বাসস্থান ঘ) শিক্ষা।

২। নিচের কোনটি হতে বস্ত্র তৈরির কাঁচামাল পাওয়া যায় না।
ক) পাট খ) তুলা
গ) ভুট্টা ঘ) রেশম।

৩। দেশের কতভাগ মানুষ প্রত্যক্ষও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল?
ক) ৭০-৮০% খ) ৮০-৯০%
গ) ৭৫-৮৫% ঘ) ৬০-৭০%।

৪। বাংলাদেশের রাজস্ব আয়ের কত ভাগ কৃষি হতে আসে?
ক) অর্ধেক খ) দুই তৃতীয়াংশ
গ) এক তৃতীয়াংশ ঘ) এক চতুর্থাংশ।

পাঠ-১.২ বাংলাদেশের কৃষির ক্ষেত্র : মাঠফসল, উদ্যান ফসল ও সামাজিক বনায়ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসলের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- মাঠ ও উদ্যান ফসলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসলের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- সামাজিক বনায়ন কী তা বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ফসল, মাঠফসল, উদ্যান ফসল, সামাজিক বনায়ন

ফসল : যে সমস্ত উদ্ভিদ মাঠে পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদন করা হয় এবং উৎপাদিত মূল দ্রব্য অথবা উপজাত দ্রব্যের আর্থিক মূল্য আছে তাদেরকে ফসল বলা হয়। যেমন, ধান, গম, সবজি ইত্যাদি। মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে যে সকল গাছপালার চাষাবাদ করে তাকেই আমরা ফসল বলতে পারি। এই ফসল বা শস্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা ও সুষ্ঠুভাবে জ্ঞানার্জন আবশ্যক।

মাঠ ফসলের শ্রেণিবিভাগ

ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে মাঠ ফসলকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

দানা জাতীয় ফসল (Cereal grain crops) : গ্রামিণী (Gramineae) পরিবারভুক্ত যেসব দানা জাতীয় ফসল প্রধানত কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার খাদ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে দানা জাতীয় ফসল বলে। যেমন ধান, গম, ভুট্টা, চীনা, জোয়ার, সরগাম ইত্যাদি।

ডাল জাতীয় ফসল (Pulse Crops) : লিগুমিনোসি পরিবারের অন্তর্গত যে সব দানা ফসল ডালের জন্য উৎপাদন করা হয় তাদের ডাল ফসল বলে। যেমন মুগ, মসুর, ছোলা, মাসকালাই এবং মটর ইত্যাদি। ডাল জাতীয় ফসল আমিষের অন্যতম উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তেলবীজ ফসল (Oilseed crop) : যে সব ফসল তেল উৎপাদনের জন্য চাষাবাদ করা হয় তাদেরকে তেলবীজ ফসল বলে। যেমন-সরিষা, সয়াবিন, তিল, তিসি ইত্যাদি। তেলবীজ ফসল স্নেহজাতীয় উপাদানের প্রধান উৎস।

চিনি ফসল (Sugar Crop) : যে সকল ফসল চিনি উৎপাদনের জন্য চাষ করা হয় তাদেরকে চিনি ফসল বলা হয়। যেমন- আখ, সুগার বিট ইত্যাদি।

আঁশ জাতীয় ফসল (Fiber Crop) : যে সব ফসল আঁশ আহরনের জন্য উৎপাদিত হয় তাদেরকে আঁশ জাতীয় ফসল বলে। যেমন- পাট, কেনাফ, মেস্তা, তুলা ইত্যাদি।

পশু খাদ্য ফসল (Fodder Crops) : যে সব ফসল পশু খাদ্যের উৎস হিসেবে চাষ করা হয় তাদেরকে পশু খাদ্য ফসল বলে। যেমন- নেপিয়ার ঘাস, দুর্বা ঘাস, ক্লোভার ইত্যাদি।

পানীয় ফসল (Beverage Crops) : পানীয় দ্রব্য উৎপাদনের জন্য যেসব ফসল চাষ করা হয় তাদেরকে পানীয় ফসল বলা হয় যেমন চা, কফি, কোকো ইত্যাদি।

নেশা জাতীয় ফসল (Narcrotic Crops) : নেশাজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনের জন্য যেসব ফসল চাষাবাদ করা হয় তাদেরকে নেশাজাতীয় ফসল বলা হয়। যেমন-তামাক, গাঁজা ইত্যাদি।

সবুজ সার ফসল (Green manuring Crop) : যে সকল ফসল সবুজ সার উৎপাদনের জন্য চাষ করা হয় তাদেরকে সবুজ সার ফসল বলে। যেমন ধৈঞ্চা, ইপিল ইপিল, কাউন ইত্যাদি।

শিল্প ফসল (Industrial Crop) : শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের জন্য যেসব ফসল চাষ করা হয় তাদেরকে শিল্প ফসল বলে। যেমন-পাট, আখ, রাবার, তুলা ইত্যাদি।

মাঠ ফসলের গুরুত্ব

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাঠ ফসলের গুরুত্ব সর্বাধিক। বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য শস্য ধান হলো মাঠ ফসলের একসাথে। চাষযোগ্য জমির অধিকাংশটি ব্যবহৃত হয় মাঠ ফসল উৎপাদনের জন্য এবং ধান সবচেয়ে বেশি জমিতে চাষ করা হয়। এছাড়াও গম, অন্যান্য ডাল জাতীয় ফসল, তেলবীজ ফসল ও চাষ করা হয়। দানাজাতীয় ফসলের ৮০-৮৫% আসে ধান থেকে এবং ৬-৮% আসে গম থেকে। ধান ও গম শর্করা জাতীয় খাদ্যের প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ডাল জাতীয় ফসল যেমন মসুর, মুগ, খেসারী ইত্যাদি উদ্ভিদজাত আমিষের উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তৈল বীজ ফসল স্নেহজাতীয় খাদ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং এ সকল উদ্ভিদজাত স্নেহ বা চর্বির পুষ্টিমান প্রাণিজ তেল থেকেও বেশি। এছাড়াও পশু পাখি, হাঁস মুরগী ও মাছের খাদ্যের অন্যতম উৎস হিসেবে ও মাঠ ফসলের অবদান রয়েছে। মাঠ ফসল যেমন, পাট ও পাটজাত দ্রব্য বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল হিসেবে বিবেচিত এবং এগুলো রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

মাঠ ফসল (Field Crop)

মাঠ ফসল বলতে অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্বলিত ফসলকে বোঝায় সেগুলো বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষ করা হয়। মাঠ ফসলকে কৃষিতাত্ত্বিক (Agronomic Crop) ফসলও বলা হয়। মাঠ ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে একই জমিতে একই ফসল চাষ করা হয়। যেমন-ধান, গম, পাট, সরিষা, ছোলা, ভুট্টা, মসুর, খেসারী, চীনা ও কাউন ইত্যাদি। মাঠ ফসলের জন্য জমিতে একইভাবে প্রস্তুত করা হয় এবং এর বীজ একসাথে ছিটিয়ে বা লাইনে বপন বা রোপন করা হয়। সাধারণত একই জমিতে বছরে এক বা দুইবার মাঠ ফসল উৎপাদন করা হয়। বিভিন্ন আন্তঃপরিচর্যা যেমন-পানি সেচ, আগাছা দমন, পানি নিস্কাশন, সার ও বালাই নাশক ইত্যাদি এক সাথে করা হয়।

মাঠ ফসলের বৈশিষ্ট্য

১। সাধারণত একসাথে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চাষ করা হয়।
২। প্রতিটি গাছ/চারার আলাদা যত্ন নিতে হয় না।
৩। মাঠ ফসলের জমিতে সাধারণত বেড়া দেয়ার প্রয়োজন হয় না।
৪। মাঠ ফসলের বীজ একসাথে ছিটিয়ে বা সারিতে রোপন বা বপন করা হয়।
৫। সাধারণত সমস্ত ফসল একসাথে কর্তন সংগ্রহ করা হয়।

উদ্যান ফসল (Horticultural crop)

উদ্যান ফসল বলতে সেসব ফসলকে বোঝায় যেগুলো অনেক সময় বেড়া দিয়ে উৎপাদন করা হয়। সাধারণত: উদ্যান ফসলের চাষ স্বল্প পরিসরে করা হয়। কিন্তু বর্তমানে ক্রমবর্ধমান মানুষের চাহিদা মিটাতে বিস্তৃত এলাকায়ও উদ্যান ফসলের চাষ করা হয়। উদ্যান ফসল বন্যামুক্ত উঁচু জমিতে বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদন করা হয়। সাধারণত বসতবাড়ির আশে পাশে উর্বর জমিতে উদ্যান ফসল চাষ করা হয়। রাস্তার ধারে, পতিত জমিতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট কথা ছোট উঁচু জমি যেখানে আছে সেখানেই উদ্যান ফসল চাষ করা হয়। এছাড়া ঘরের বারান্দায়, ছাদে টবের মধ্যেও চাষ করা হয়। উদ্যান ফসল চার প্রকার। যথা-(১) ফল জাতীয় ফসল: যেমন, আম, কাঁঠাল, কলা, পেয়ারা, লিচু, আনারস, পেঁপে, কুল ইত্যাদি। (২) ফুল জাতীয় ফসল : যেমন-গোলাপ, গাঁদা, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, গ্লাডিওলাস, চন্দ্রমল্লিকা ইত্যাদি। (৩) শাক সবজি জাতীয় ফসল : বেগুন, টমেটো, বাধাঁ কপি, ফুলকপি, ডাটা শাক ইত্যাদি। (৪) মসলা জাতীয় ফসল: যেমন, পেঁয়াজ, রসুন হলুদ, আদা, এলাচ ইত্যাদি।

উদ্যান ফসলের বৈশিষ্ট্য

১। সাধারণত স্বল্প জমিতে চাষ করা হয়।

২। জমি উঁচু হতে হবে, জমির চারপাশে অনেক সময় বেড়া দিতে হয়।

৩। প্রতিটি গাছের আলাদা যত্ন নিতে হয়।

৪। তুলনামূলক বেশি যত্ন নিতে হয়।

৫। ফসলের মূল্য মৌসুমের শুরুতে বেশি হয়। ফসল উৎপাদন খরচ কম হয় এবং লাভ বেশি হয়।

৬। ফসল উৎপাদনে ঝুঁকি কম।

৭। একই জমির সব ফসল একই সময়ে পরিপক্ক হয় না তাই কয়েকবার ফসল সংগ্রহ করতে হয়।

৮। আন্তঃপরিচর্যা বেশি করতে হয় এবং নিয়মিত পানি সেচ দিতে হয়।

৯। এরা স্বল্প সময়ের, একবর্ষজীবী, দ্বিবর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী হতে পারে।

১০। ফসল সাধারণত তাজা বা রন্ধন অবস্থায় ব্যবহার করতে হয়।

১১। বেশিরভাগ উদ্যান ফসলই দ্রুত পচনশীল।

১২। উদ্যান ফসলের বীজ বা চারা সাধারণত সারিতে বপন বা রোপন করা হয়।

উদ্যান ফসলের গুরুত্ব

বাংলাদেশের ব্যবসায়িক লাভের উদ্দেশ্যে বিস্তৃত মাঠে উদ্যান ফসল চাষ করা হয়। তবে স্বল্প পরিসরে পারিবারিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যই মূলত উদ্যান ফসল চাষ করা হয়। পরিবারের ফল ও শাকসবজির চাহিদা যোগান দেয়ার পাশাপাশি বাড়তি ফসল বিক্রয় করে নগদ অর্থ উপার্জিত হয়। এছাড়া গৃহপালিত পশুর খাদ্যের উৎস হিসেবে ফল গাছের পাতা ব্যবহৃত হয়। বয়স্ক ফল গাছ থেকে উন্নত জাতের কাঠ ও জ্বালানি পাওয়া যায়। এছাড়া ফুল চাষের মাধ্যমে যেমন বিনোদন পাওয়া যায় তেমন ফুল চাষ করে অনেক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূর হচ্ছে। ফল, শাকসবজি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং এগুলো বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জিত হচ্ছে।

মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসলের তুলনামূক বৈশিষ্ট্য

মাঠ ফসল	উদ্যান ফসল
১. জমিতে সাধারণত সমষ্টিগত পরিচর্যা করা হয়, অর্থাৎ প্রতিটি গাছের জন্য পৃথক পরিচর্যা করা হয় না।	১. প্রতিটি গাছের পরিচর্যা পৃথকভাবে করা হয়।
২. সাধারণত ফসলের মাঠে বেড়া দেওয়া হয় না।	২. অনেক সময় ফসলের মাঠে বেড়া দেওয়া হয়।
৩. ফসলের উপর ভিত্তি করে নিচু, মাঝারি ও উঁচু সব ধরনের জমিতে চাষ করা যায়।	৩. সাধারণত উঁচু জমিতে চাষ করা হয়।
৪. সাধারণত এই জমির সব ফসল একই সময় পরিপক্ক হয় এবং একই সময়ে সংগ্রহ করা হয়।	৪. একই জমির ফসল বিভিন্ন সময় পরিপক্ক হয় এবং কয়েকবার সংগ্রহ করা হয়।
৫. প্রায় সব মাঠ ফসলই শুকিয়ে ব্যবহার করা হয়।	৫. প্রায় সব উদ্যান ফসলই তাজা অবস্থায় ব্যবহার করা হয়।
৬. শুকিয়ে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।	৬. বিশেষ প্রক্রিয়াজাতকরণ ছাড়া বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায় না।
৭. দ্রুত পচনশীল নয়।	৭. দ্রুত পচনশীল
৮. সেচ কম দিলেও তেমন ক্ষতি হয় না।	৮. নিয়মিত সেচ দিতে হয়।

সামাজিক বনায়ন (Social Afforestration)

আদিমকাল থেকেই বৃক্ষ আমাদের পরম বন্ধু। প্রাচীনকালে মানুষের যখন ঘরবাড়ি ছিল না তখন মানুষ গাছেই বাস করত। আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য যে অক্সিজেন প্রয়োজন সেটিও বৃক্ষই যোগান দেয়। মানুষসহ অন্যান্য জীবের অস্তিত্ব রক্ষায় বৃক্ষের অবদান অপরিসীম। প্রতিটি দেশের আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বৃক্ষ বা বনভুমি থাকা প্রয়োজন। এ জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু বনায়ন ব্যবস্থাপনা। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে থেকে বনায়ন কর্মসুচী গ্রহণ করে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে 'সামাজিক বনায়ন হলো এমন বন ব্যবস্থাপনা বা কর্মকান্ড যার সাথে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠি ওতপ্রোতভাবে জড়িত'। এর মাধ্যমে উপকারভোগী জনগণ কাঠ ও জ্বালানি, খাদ্য, পশু খাদ্য ও জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পেয়ে থাকে।

চিত্র ১.২.১ : সামাজিক বনায়ন।

সুতরাং বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করে পরিচালিত বনায়ন কার্যক্রমকে সামাজিক বনায়ন বলে। অর্থাৎ যে বনায়ন বা বন ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণ সরাসরি জড়িত থাকে বা অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে এবং জনগণ দ্বারা সৃষ্ট বনকে সামাজিক বনায়ন বা বন বলে।

প্রকারভেদ (Classification)

সামাজিক বনায়ন বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন: (১) কমিউনিটি বনায়ন (২) গ্রামীণ বনায়ন (৩) অংশীদারিত্ব বনায়ন (৪) স্বনির্ভর বনায়ন

সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Social Afforestration)

ক. প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা, পরিবেশ দূষণ ও মরু প্রক্রিয়া থেকে দেশকে রক্ষা করা।

খ. ভুমির সুষ্ঠু ও উৎপাদনমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করা।

গ. দেশের বিরাজমান গাছ ও জ্বালানি কাঠের ঘাটতি নিরূপণ করা।

ঘ. গ্রামীণ ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের কাঁচামাল ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঙ. পতিত, অনাবাদী ও প্রান্তিক জমির সুষ্ঠু ব্যবহার করা।

বাংলাদেশের সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী

বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন গ্রামীণ জনপদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র-বিমোচনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। সে সাথে সামাজিক বনায়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজনে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবেলায় লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার সামাজিক বনায়নের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বন বিভাগ ১৯৬০ দশকের শুরুর দিকে বন সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বনায়ন কর্মসূচী বনাঞ্চলের বাইরে জনগণের কাছে নিয়ে যায়। বাংলাদেশের বন বিভাগ ১৯৮১-৮২ সালে এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের (আইডিবি) আর্থিক সহযোগীতায় উত্তরাঞ্চলের ২৩ টি জেলার জনগণকে অংশীদার করে প্রথম সামাজিক বনায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এরপর ১৯৯৫-৯৭ সালে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করে সম্প্রসারিত সামাজিক বনায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। ১৯৯৫-২০০২ সালে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে উপকুলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। সামাজিক বনায়নকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সরকার ২০০৪ সালে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা প্রবর্তন করে। যা আরো কার্যকর ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে সংশোধনী আনা হয়। সংশোধিত বিধিমালায় সরকারী বন ভূমিতে বনায়নের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

সামাজিক বনায়নের গুরুত্ব

১। সামাজিক বনায়নের উৎপাদিত বনজ দ্রব্য: ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০৫-০৬ সাল পর্যন্ত সামাজিক বনায়ন থেকে বিপুল পরিমাণ বনজ দ্রব্য আহরিত হয়। এসব বনজ দ্রব্য বিক্রয় হয়েছে ২৩৭ কোটি ২ লাখ ৮ হাজার ৭৫৫ টাকা যা দেশের অথনীতিতে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে।

২। পরিবেশ রক্ষায়: পরিবেশের ভারসাম্য ধরে রাখতে সামাজিক বনায়ন ভূমিকা রাখছে।

৩। উপকুলীয় বনাঞ্চল: ১৯৬০ সাল থেকে বন বিভাগ সামুদ্রিক ঝড়-ঝঞ্চা ও জলোচ্ছাসের ক্ষতি মোকাবেলা করতে উপকুলীয় ১০ জেলার বাঁধের উপর বনায়ন কার্যক্রম শুরু করে। ২০০৬ সাল পর্যন্ত ১.৫১ লাখ হেক্টর ভূমি উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে সমুদ্র গর্ভ থেকে পুনুরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এতে দেশের প্রায় ১% ভূমি বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। মরুময়তারোধে বনায়ন: দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুময়তা রোধ করার জন্য বনবিভাগ ব্যাপক বনায়ন করেছে। বনায়নের ফলে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার যথেষ্ট অনুকুল ও কৃষিবান্ধব হয়েছে যার ফলে এটি দেশের অর্থনীতিতে যথেষ্ট অবদান রাখছে।

৫। শিল্প বনায়ন: চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট ও পাবর্ত্য চট্রগ্রামে ১৯৯৭-৯৮ থেকে ২০০৬-০৭ সাল পর্যন্ত বন বিভাগের হস্তক্ষেপে ২৪ হাজার ৪০১ হেক্টর শিল্প বনায়ন হয়েছে। এসব বনায়ন থেকে কম মূল্যে বিভিন্ন মিল কারখানার কাঁচামাল সরবরাহ করা হচ্ছে।

৬। ঔষধি বনায়ন: সামাজিক বনায়নের আওতায় বন বিভাগ স্বাস্থ্য সেবা ও ঔষধ শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা মেটাতে ঔষধি বনায়ন শুরু করেছে যা দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলের ৬ শত একর ভূমি নিয়ে বিস্তৃত।

বাংলাদেশে সামাজিক বনায়নের সুযোগ

সরকারী বনভূমি ব্যতীত বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রচুর সুযোগ রয়েছে যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণ, অফিস অঙ্গন, রাস্তার ধার, পতিত জমি, কৃষি জমির আইল, সড়কের ধার, নদী ও খালের পাড়, বাঁধের পাড়, জলাশয় ও পুকুরপাড়, মসজিদের অঙ্গন, গোরস্থান, উদ্যান, বসতবাড়ির আশেপাশে, শিল্প এলাকায়, শহরের প্রধান সড়কের পাশে, গো-চারণ ভূমি, বাণিজ্যিক ভূমি, বাণিজ্যিক এলাকা, উপকূলীয় এলাকা।

মানবজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বনায়নের বিকল্প নেই। সেজন্য আমাদের বেশি করে গাছ লাগাতে হবে, নতুন নতুন সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি করতে হবে এবং বর্তমান যে বনাঞ্চল রয়েছে সেটির রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে মাঠ ও উদ্যান ফসলের বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক বনায়নের গুরুত্ব আলোচনা করবে।

সারাংশ

মাঠ ফসল সাধারণত বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষ করা হয় এবং একই ধরণের জমিতে একই ফসল চাষ করা হয়। যেমন ধান, গম ইত্যাদি। উদ্যান অনেকসময় ফসল বেড়া দিয়ে স্বল্প পরিসরে চাষ করা হয় এবং একই জমিতে বিভিন্ন ফসল যেমন- ফুল, ফল ও শাকসবজি চাষ করা হয়। আবার কোন অঞ্চলের মানুষের অংশগ্রহনে সৃষ্ট বনায়নই সামাজিক বনায়ন। দেশের অর্থনীতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সামাজিক বনায়নের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি নেশা জাতীয় ফসল?
ক) চা খ) তামাক
গ) সরগাম ঘ) চীনা

২। কোনটি আঁশ জাতীয় ফসল?
ক) কেনাফ খ) রেড়ি
গ) কুস্তি ঘ) বীট

৩। উদ্যান ফসলের বৈশিষ্ট্য-
ক) বেড়া দিতে হয় না খ) বেড়া দিতে হয়
গ) নিচু জমিতে চাষ করা হয় ঘ) বিস্তৃত এলাকায় চাষ করা হয়।

৪। মাঠ ফসলের বৈশিষ্ট্যগুলো হল-
i) মাঠে বেড়া লাগানো হয় ii) দ্রুত পঁচনশীল iii) দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৫। সামাজিক বনায়নের উদ্দেশ্য কী?
ক) মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন খ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা
গ) অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া ঘ) উপরের সবগুলো

৬। সামাজিক বনায়নের প্রকারভেদ হলো-
i) কমিউনিটি বনায়ন ii) গ্রামীণ বনায়ন iii) স্বনির্ভর বনায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৩ বাংলাদেশের কৃষির ক্ষেত্রঃ মৎস্য, গবাদিপশু ও পোল্ট্রি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মৎস্য বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- মাছ উৎপাদনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করতে পারবেন;
- গবাদিপশুর ক্ষেত্র সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- গবাদিপশুর গুরুত্ব ব্যাখা করতে পারবেন;
- পোল্ট্রি ক্ষেত্র সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- পোল্ট্রি উৎপাদনের বিভিন্ন বিষয় জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গাবাদিপশু, পোল্ট্রি, মৎস্য, প্রতিবেশ, পোল্ট্রি বিজ্ঞান, পোল্ট্রি শিল্প।

মৎস্য (Fish)

মৎস্য উৎপাদন কৃষি ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এ উৎপাদন ব্যবস্থার ভৌত পরিবেশ হচ্ছে নদী, নালা, খাল, বিল, হাওর, বাঁওর, পুকুর, ডোবা, দীঘি, হ্রদ, নদ-নদী এবং সমুদ্র ইত্যাদি। এছাড়াও বর্তমানে পতিত জমি ও ফসলের জমি খনন করে এবং ঘের তৈরী করেও মাছের চাষ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি ফসলের পরেই মাছের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের মানুষের শতকরা ৬০ ভাগ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করে মাছ।

মৎস্য প্রজাতি ও এর চাষ (Fish species and cultivation)

মাছ শীতল রক্ত বিশিষ্ট জলজ মেরুদন্ডী প্রাণী। এদের দেহে জোড় বক্ষ শ্রেণি পাখনা থাকে। প্রতিটি পাখনার মাঝে কাঁটা থাকে। এরা ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। মৎস্য বলতে সকল জলজ প্রাণী যেমন-মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, ঝিনুক, ডলফিন ইত্যাদিকে বোঝায়। মাছের প্রজাতির সংখ্যা ২০,০০০ এর মত। বাংলাদেশে স্বাদু ও লোনা পানিতে মাছের প্রজাতির সংখ্যা যথাক্রমে ২৯৬ ও ৫১১ (কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৫)।

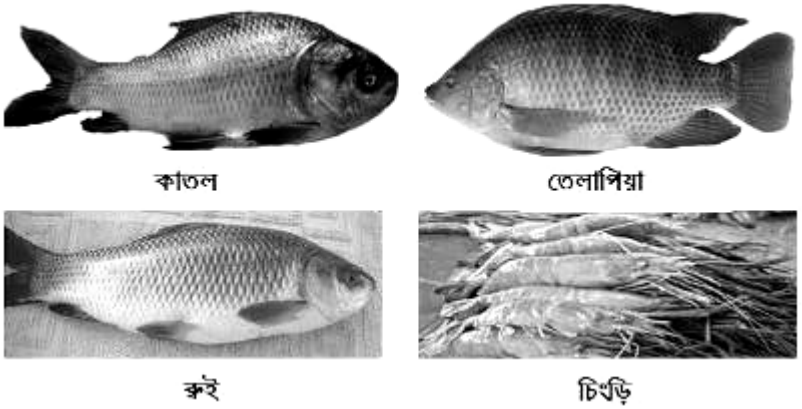

চিত্র ১.৩.১ : মৎস্য প্রজাতি

মৎস সম্পদের অবকাঠামো

বাংলাদেশে মৎস্য হ্যাচারীর সংখ্যা ৯০২টি। এর মধ্যে সরকারি ৮৯টি এবং বেসরকারি ৮১৩টি। গলদা হ্যাচারি ৩৬টি (সরকারি ১৭টি, বেসরকারি ১৯টি) এবং বাগদা হ্যাচারি ৪৯টি (বেসরকারি)। বাংলাদেশে মৎস্য। চিংড়ি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা ৬টি, মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমি ১টি, মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট ৪টি, চিংড়ি প্রদর্শনী খামার ২টি। মৎস্য হ্যাচারি/মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার ১৩৬টি। চিংড়ি আহরণ ও সেবা কেন্দ্র ২০টি। মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র (বিএফডিসি) ৯টি এবং মৎস্য গবেষণার জন্য উপকেন্দ্র ১০টি।

মাছ উৎপাদনের গুরুত্ব

বাংলাদেশ মৎস্য উৎপাদনের জন্য খুবই অনুকুল এবং পানি সম্পদে সমৃদ্ধ। ১৯৮০ সালে প্রথম বাংলাদেশে বিদেশী মৎস্য প্রজাতির চাষ বাণিজ্যিকভাবে শুরু হয়। এ সময় থেকে পতিত জমি, ধান ক্ষেত, ডোবা, নালা ও হাজামজা পুকুরকে মাছ চাষের উপযোগী করে তোলা হয়। বিভিন্ন ধরনের বিদেশী মৎস্য প্রজাতি যেমন কার্প, সিলভার কার্প, পাঙ্গাশ, মিরর কার্প, থাই সরপুঁটি, তেলাপিয়া ইত্যাদি বাংলাদেশে ব্যপক হারে চাষ হয়। এতে মাছের বাজারমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আসে এবং টাটকা মাছ বাজারে পাওয়া যায়। মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ অনেক সফলতা লাভ করেছে। মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন ৪র্থ স্থান দখল করেছে। মানুষের আমিষের ঘাটতি কমে আসছে এবং মাথাপিছু মাছ খাবার পরিমান বেড়ে গেছে। জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩.৬৫%।

মাছ উৎপাদনে পারিবারিক ও জাতীয় উন্নয়নে ভুমিকা

১। মাছ বাংলাদেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস।
২। মাছ উৎপাদন, পরিচর্যা, বাজারজাতকরণ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপনন ইত্যাদি বিপুল মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করে।
৩। মাছের উপজাত থেকে প্রস্তুতকৃত ফিস মিল, জৈব সার ও পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
৪। ফসল-গাভী, হাঁস, মুরগী ও মাছের সমন্বিত চাষ অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।
৫। মাছের তেল, সাবান, ঔষধ, গ্লিসারিন, বার্নিশ প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহার হয়।
৬। মাছের কাঁটা, দাঁত, লেজ ইত্যাদি থেকে সৌখিন দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।
৭। বাংলাদেশ হিমায়িত মাছ, চিংড়ি, শুটকি, লবণজাত মাছ এবং অন্যান্য মৎস্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।
৮। মৎস্যজাত শিল্প কারখানা যেমন বরফ তৈরী, জাল বুনন ও মেরামত, মাছ ধরার অন্যান্য উপকরণ তৈরি শিল্প গড়ে উঠেছে।

মাছের প্রতিবেশ

মাছের প্রতিবেশ দু'ধরনের:
১। আভ্যন্তরীন জলাশয় ২। উন্মুক্ত জলাশয়
১। আভ্যন্তরীন জলাশয়: দেশের স্থলভাগে যে সমস্ত জলাশয় রয়েছে তাই আভ্যন্তরীণ জলাশয়।
আভ্যন্তরীন জলাশয়ের প্রকারভেদ:

১. মুক্ত জলাশয়: নদী, সুন্দরবন, কাপ্তাই লেক, বিল, হাওর ইত্যাদি। এই মুক্ত জলাশয়ের জমির পরিমাণ প্রায় ৩৯১৬৮২৮ হেক্টর (কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৫)
২. বদ্ধ জলাশয়: পুকুর, ডোবা ও দীঘি। মোট আয়তন ৭৮২৫৫৯ হেক্টর।
৩. বাঁওর: নদীর প্রবাহ বাধা প্রাপ্তির জন্য নদীর কিছু অংশ বদ্ধ জলাশয়ের সৃষ্টি করে, একেই বাঁওর বলে। এদেশে বিভিন্ন আকারের প্রায় ৮০ টি বাঁওর আছে। কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ও সিলেট জুড়ে এই বাঁওরগুলোর অবস্থান এবং আনুমানিক মোট আয়তন ৫.৪৮৮ হেক্টর।
৪. চিংড়ির ঘের প্রতিবেশ: জোয়ারের পানি আটকিয়ে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় এলাকা যেমন খুলনা, বাগেরহাট সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামে বাগদা ও গলদা চিংড়ির ঘের খামারগুলো অবস্থিত। অধিকাংশ

ঘের দেশীয় পদ্ধতিতে করা হয়। ঘের চাষের মোট আয়তন ১৭৫২৭৪ হেক্টরের মত। গলদার ফলন ৫০০-৬০০ কেজি এবং বাগদার ফলন ২৫০-৩০০ কেজি হেক্টরে। (কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৫)

৫. লেক বা হ্রদ: কৃত্রিম বা স্বাভাবিক বৃহৎ আকারের বদ্ধ জলরাশিকে লেক বা হ্রদ বলে। যেমন ফয়েজ লেক, কাপ্তাই লেক।

২। উন্মুক্ত জলাশয় (আয়তন ৩৯১৬৮২৮ হেক্টর)

(ক) নদনদী: বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, আত্রাই, বুড়িগঙ্গা ইত্যাদি অনেক ছোট বড় নদী বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। মোহনাসহ এর মোট আয়তন ৮৫৩৮৬৩ হেক্টর। এই উন্মুক্ত জলাশয় থেকে প্রতি বছর ২.৫-৩.০ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ ধরা হয়।

(খ) প্লাবন ভূমি: বর্ষার সময় বৃষ্টির পানি এসে নদীর উভয় কূল প্লাবিত করে এবং খাল বিল ভরে যায়। এ অবস্থা প্রায় ৪/৫ মাস থাকে। এ প্লাবিত ভূমির আয়তন ২৭০২৩০৪ হেক্টর।

(গ) হাওড় ও বিল: হাওড় ও বিল প্রতিবেশ মোটামুটি একই ধরনের। হাওড় আয়তনে বিলের চেয়ে বড় হয়। হাওড় ও বিলে মাছ ও বোরো ধান চাষ করা হয়। বাংলাদেশে সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় হাওড়গুলোর অবস্থান কিন্তু বিল অনেক জেলাতেই রয়েছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হাওড় সিলেটের হাকালুকি হাওড় এবং সবচেয়ে বড় বিল নাটোরের চলনবিল।

(ঘ) সামুদ্রিক জলাশয়: বাংলাদেশে সামুদ্রিক লোনা পানির মাছের প্রতিবেশ হল বঙ্গোপসাগর। এ জলরাশির আয়তন ১৬৬০০ বর্গকিলোমিটার। লোনা পানির অনেক প্রজাতির মাছ এখানে পাওয়া যায়।

গবাদি পশু

বাংলাদেশের কৃষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল গবাদি পশু। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্বলিত পশু গৃহে স্থায়ীভাবে লালন পালন করে আসছে, এদেরকে গবাদি পশু বলা হয়। বাংলাদেশে গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রধান।

চিত্র ১.৩.২ : গবাদি পশু

সারনি: গবাদি পশুর সংখ্যা (লক্ষ)

পশু	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
গরু	২৩০.৫১	২৩১.২১	২৩১.৯৫	২৩৩.৪১	২৩৪.৮৮	২৩৬.৩৬	২৩৭.৩৫
মহিষ	১৩.৪৯	১৩.৯৪	১৪.৪৩	১৪.৫০	১৪.৫৭	১৪.৬৪	১৪.৭১
ছাগল	২৩২.৭৫	২৪১.৪৯	২৫১.৭৬	২৫২.৭	২৫৪.৩৯	২৫৬.০২	২৫৭.৬৬
ভেড়া	২৯.৭৭	৩০.০২	৩০.৮২	৩১.৪৩	৩২.০৬	৩২.৭০	৩৩.৩৫

তথ্যসূত্র : প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর, ২০১৭

গবাদি পশু হতে প্রাপ্ত উপজাত দ্রব্যসমূহ

গবাদি পশু জবাইয়ের পর বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল খাদ্য অনুপযোগী দ্রব্য জমা হয় সেগুলোকে গবাদিপশুর উপজাত দ্রব্য বলা হয়। এগুলো হল বর্জ্য মাংস, হাঁড়, রক্ত, নাড়িভূড়ি, মলমূত্র ইত্যাদি। এ উপজাতদ্রব্যগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে বিভিন্ন কাজে লাগানো যেতে পারে। আবার এগুলো যথাযথ সংরক্ষণের পরিবেশ ও দূষণের হাত থেকে রক্ষা পায়। উপজাতগুলো দিয়ে উৎকৃষ্ট জৈব সার ও মাছের খাদ্য তৈরি করা যায়। হাড় ও শিং বিভিন্ন সৌখিন দ্রব্য তৈরিতে কুটির শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

গবাদি পশুর গুরুত্ব

আমাদের জীবনে গবাদি পশুর গুরুত্ব অনেক। নিম্নে গবাদি পশুর নানাবিধ গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:

১. জমি চাষ করতে গরু-মহিষ ব্যবহৃত হয়।
২. শস্য মাড়াই করতে গরু মহিষ ব্যবহার করা হয়।
৩. পণ্য পরিবহনের জন্য গরু, মহিষ ও ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করা হয়।
৪. তেলের ঘানি, আখ মাড়াই মেশিন ইত্যাদি পরিচালনায় প্রয়োজনীয় শক্তি গরু মহিষের মাধ্যমে পাওয়া যায়।
৫. প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস হল গবাদি পশুর মাংস ও দুধ।
৬. গবাদি পশু এবং তাদের মাংস ক্রয়-বিক্রয় করে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়।
৭. কোন কোন গবাদি পশু যেমন ছাগল ও ভেড়া পালনে মূলধন কম লাগে।
৮. দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বিক্রি করে প্রচুর আয় করা হয়।
৯. গবাদিপশুর চর্বি সাবান তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
১০. জ্বালানি হিসেবে গোবর ব্যবহৃত হয়।
১১. গবাদিপশুর মলমূত্র (গোবর) উৎকৃষ্ট জৈব সার হিসেবে জমিতে ব্যবহৃত হয়।
১২. গোবর থেকে বায়োগ্যাস তৈরি করে জ্বালানি ও বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করা যায়।
১৩. গবাদিপশু বিক্রয় করে এককালীন অনেক অর্থ পাওয়া যায়।
১৪. ভেড়া-ছাগলের পশম দ্বারা দামী শীতবস্ত্র তৈরি করা হয়।
১৫. গবাদিপশুর চামড়া, পশম, হাড় ইত্যাদি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়।

পোল্ট্রি

বাংলাদেশে কৃষির একটি অন্যতম ক্ষেত্র হল পোল্ট্রি বা গৃহপালিত পাখি। যে সকল জীবের পাখনা আছে, যারা উড়তে পারে এবং ডিম দেয় তাদেরকে পাখি বলা হয়। আবার অর্থনৈতিক প্রয়োজনে মানুষ যেসব পাখি গৃহে পালন করে তাদের গৃহপালিত পাখি বলে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গৃহপালিত পাখি অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। বাংলাদেশে গৃহপালিত পাখি যেমন হাঁস-মুরগী, কবুতর উল্লেখযোগ্য। সাধারণত গ্রামের প্রতিটি পরিবারেই গৃহপালিত পাখি পালন করা হয়। এগুলো একদিকে যেমন পরিবারের ডিম ও মাংসের চাহিদা মেটায় তেমনি বাড়তি অংশ বিক্রয় করে অর্থনৈতিভাবে লাভবান হওয়া যায়। গ্রামের পরিবারে সাধারণত দেশীয় জাতের পোল্ট্রি পালন করা হয়। তবে বর্তমানে অনেকেই পোল্ট্রি শিল্প গড়ে

তুলতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। এজন্য নতুন জাত উদ্ভাবনের জন্য বিজ্ঞানীরা নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং বিদেশ থেকেও উন্নত জাত আমদানি করা হয়েছে। যেমন 'জাপানি কোয়েল' নামক এক প্রকারের পাখি বাংলাদেশে পালন করা হচ্ছে। সম্প্রতি সরকারি গবেষণা কেন্দ্রে প্রাণীবিজ্ঞানীরা 'শুভ্রা' নামে একটি ডিম পাড়া মুরগীর জাত উদ্ভাবন করেছেন। এ জাতের মুরগী বছরে ২৮০-২৯৫ টি ডিম দেয়।

পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি বিজ্ঞানের ধারণা

অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্বলিত যে সব পাখি মানুষের তত্ত্বাবধানে থেকে মুক্তভাবে বংশবৃদ্ধি করে এবং যাদেরকে পারিবারিক বা খামার ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিকভাবে পালন করা হয় তাদেরকে গৃহপালিত পাখি বা পোল্ট্রি বলে। যেমন হাঁস, মুরগী, কোয়েল, কবুতর ইত্যাদি।

বিজ্ঞানের যে শাখায় গৃহপালিত পাখি নিয়ে গবেষণা করা হয় বিশেষ করে পাখির খাদ্য, প্রজনন, বিভিন্ন ভৌগলিক পরিবেশে তাদের অবস্থান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে পোল্টি বিজ্ঞান বলে।

চিত্র ১.৩.৩ : গৃহপালিত পাখি

পোল্ট্রি শিল্পের ধারনা

বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নত ব্যবস্থাপনায় উন্নত জাতের হাঁস মুরগী ও কোয়েল পালন করা হচ্ছে। এ কৃষি ক্ষেত্রের গুরুত্ব বিবেচনা করে এটিকে বাণিজ্যিকভাবে একটি শিল্পের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এদেশের অনেক বেকার যুবক-যুবতী তাদের শ্রম দিয়ে নতুন নতুন পোল্ট্রি শিল্প গড়ে তুলছে এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশে বর্তমানে দেড় লক্ষের কিছু কম পোল্টি খামার চালু আছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের পোল্ট্রি খামারের সংখ্যা ১৪৮৯৩৩ এবং এই খাত থেকে নির্বাহকারী মানুষের সংখ্যা হল ২২৩৩৯৯৫ জন।

পোল্ট্রির (মুরগী) শ্রেণীবিন্যাস

জাত, উপজাত ও স্ট্রেইন মিলিয়ে প্রায় ২০০ প্রকারের মুরগী আছে। এদেরকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১। উৎপত্তিভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

২। উৎপাদনভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

১। উৎপত্তি স্থানের উপর ভিত্তি করে মুরগীর জাত ৪ প্রকার যথা:

(ক) আমেরিকান শ্রেণীর-যেমন রোড আইল্যান্ড রেড, নিউ হ্যাম্পাশায়ার, প্লাইমাউথ রক ইত্যাদি।

(খ) ভূ-মধ্যসাগরীয় শ্রেণী: যেমন, লেগহর্ণ, মিনর্কা, অ্যানকোনা ইত্যাদি।

(গ) ইংলিশ শ্রেণী: যেমন, অস্ট্রারলর্প, কার্ণিশ, সাসেক্স ইত্যাদি।

(ঘ) এশিয়া শ্রেণী: যেমন: ব্রাহমা, কোচিন, আসিল ইত্যাদি।

২। উৎপাদনভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

ডিম ও মাংস উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে মুরগীর বিশুদ্ধজাত গুলোকে ৩ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(ক) ডিম উৎপাদনকারী জাত: এ জাতের মুরগী আকারে ছোট ও ওজনে তুলনামূলকভাবে হালকা হয়ে থাকে। তবে এরা বেশ বড় আকারের ডিম দেয়। বছরে ২৫০-৩০০ টি বা তার চেয়ে বেশি ডিম ও দিতে পারে। যেমন, লেগহর্ণ, মিনর্কা, স্টারক্রস সাদা, ইসাব্রাউন ইত্যাদি।

(খ) মাংস উৎপাদনকারী জাত: এ মুরগী আকারে বেশ বড় ও ওজনে খুব ভারী। এদের শারীরিক বৃদ্ধি খুব বেশি হয় তবে এরা ডিম কম দেয়। এরা ৬-৮ সপ্তাহে ১.৫-২.০ কেজি ওজনের হয়ে থাকে এবং পূর্ণবয়সে ৪ কেজি পর্যন্তও হয়। এদের মাংস অত্যন্ত নরম ও সুস্বাদু হয়ে থাকে। এদের খাদ্যকে মাংসতে রুপান্তরিত করার ক্ষমতা (১.৮:১) অর্থাৎ এরা গড়ে ১.৮ কেজি খাদ্য গ্রহন করে ১ কেজি মাংস উৎপাদন করতে সক্ষম।

(গ) ডিম ও মাংস উৎপাদনকারী বা দ্বৈত জাত: এ জাতের মুরগীর আকার মাঝারি ও ওজনে মোটামুটি ভারী, এরা মাঝারি পরিমান ডিম ও মাংস দেয়। উদাহরণ: রোড আইল্যান্ড রেড, নিউ হ্যাম্পশায়ার, অস্ট্রালপ ইত্যাদি।

পোল্ট্রির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মানুষের খাদ্য সরবরাহ, পুষ্টির চাহিদাপুরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি নানাবিধ ক্ষেত্রে পোল্টির গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে পোল্ট্রির অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করা হলো।

১। পোল্ট্রির মাংস ও ডিমের চাহিদা থাকায় এগুলো বিক্রয় করে অর্থ উপার্জন করা যায়।

২। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অল্প সময়ে অনেক মুরগী পালনের মাধ্যমে বেশী অর্থ উপার্জন করা যায়।

৩। হাঁস মুরগীর খামার করে অনেক বেকার জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়।

৪। পোল্ট্রির শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্প যেমন: পোল্ট্রির খাদ্য ও ঔষধ ইত্যাদি শিল্প গড়ে ওঠে এবং অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৫। পোল্ট্রি পালন করে পরিবারে বাড়তি আয় করা যায়।

৬। হাঁস মুরগীর বিষ্ঠা ব্যায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এর কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৭। পোল্ট্রির মাংস ও ডিম মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে অনেক ভূমিকা রাখে।

৮। পোল্ট্রির বিষ্ঠা ও লিটার থেকে উৎকৃষ্ট জৈব সার তৈরি করা হয়।

৯। পোল্ট্রির উপজাত দ্রব্য যেমন রক্ত, নাড়িভুড়ি বিশেষ ব্যবস্থায় প্রক্রিয়াজাত করে পাখির ও মাছের খাদ্য তৈরী করা যায়।

১০। বিনোদন: অনেক পাখিই মানুষের বিনোদনের খোরাক যোগায়। যেমন: মোরগের লড়াই, কবুতরের ডাক ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মৎস্য, গবাদিপশু ও পোল্ট্রির গুরুত্বের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে।

সারাংশ

মাছ শীতল রক্ত বিশিষ্ট জলজ মেরুদন্ডী প্রাণী। বাংলাদেশ মৎস্য প্রতিবেশ ও মৎস্য উৎপাদনের জন্য খুবই অনুকুলে এবং মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ ৪র্থ স্থান দখল করেছে। যেসব পশু গৃহে পালন করা হয় তাদেরকে গবাদি পশু বলা হয়। গবাদি পশুর মাংস, দুধ খাদ্য ও আমিষের উৎস হিসেবে এবং গবাদি পশু হতে প্রাপ্ত উপজাত বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পোল্ট্রি শিল্পের ভূমিকা ব্যপক। সাধারণত গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই গৃহপালিত পাখি ও পোল্ট্রি পালন করা হয় এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর ভূমিকা অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের স্থান কত তম?
ক) ৩য় খ) ২য়
গ) ৪র্থ ঘ) ১ম

২। মাছের প্রতিবেশ কয় ধরনের?
ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

৩। নিচের কোনটি গবাদিপশু নয়?
ক) মহিষ খ) ছাগল
গ) বাঘ ঘ) গরু

৪। নিচের কোনটি ভূ-মধ্যসাগরীয় শ্রেণীর পোল্ট্রি?
ক) ব্রাহমা খ) কোচিন
গ) লেগহর্ণ ঘ) আসিল

৫। পারিবারিক ও জাতীয় জীবনে মাছের ভূমিকা নিম্নরুপ
i) প্রাণিজ আমিষের উৎস
ii) সৌখিন দ্রব্য প্রস্তুত
iii) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬. ডিম পাড়া মুরগীর জাতগুলো হল-
i) শুভ্রা
ii) লেগহর্ন
iii) সাসেক্স
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৪ বাংলাদেশ কৃষি তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির উৎস : কৃষক, বিদ্যালয়, ইন্টারনেট এবং ই-কৃষি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষি তথ্য ও সেবায় কৃষক বিদ্যালয় এর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;
- কৃষি তথ্য ও সেবায় অভিজ্ঞ কৃষকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পাররেন;
- কৃষকসভা ও উঠোন বৈঠক সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- কৃষি তথ্য ও সেবায় ইন্টারনেটের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কৃষক, বিদ্যালয়, কৃষক সভা, উঠোন বৈঠক, ইন্টারনেট, ই-কৃষি

নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা কৃষি উন্নয়নের মুল চাবিকাঠি। কিন্তু শুধু কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করলেই হবে না, পাশাপাশি এটি কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে যাতে কৃষক এর সুফল পেতে পারে। কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন থেকে কৃষকের কাছে হস্তান্তর পর্যন্ত দ্রুত প্রবাহের ব্যবস্থা, অবাধ ও সময়োপযোগী হতে হবে। তথ্য প্রবাহ সঠিকভাবে তথ্য ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছাতে হবে যাতে এটি তথ্য ব্যবহারকারীর বোধগম্য হয় এবং প্রযুক্তির সুফল যথাযথভাবে মানব কল্যাণে কাজে লাগে। কৃষি তথ্য ও সেবায় বাংলাদেশে কৃষি ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় নতুন নতুন তথ্য সেবা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদি বেশ এগিয়ে গেছে এবং কৃষি তথ্য প্রবাহে সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলছে।

অভিজ্ঞ কৃষক/কৃষাণী

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে ৭০-৮০% লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত। এর মধ্যে ৪৭ ভাগের মত লোক শুধু কৃষির উপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহ করে। এ সকল কৃষক জীবনের দীর্ঘ সময় ধরে কৃষি কাজে নিয়োজিত থাকেন। এ কারণে মাঠ ও উদ্যান ফসল, বনায়ন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। ফসল চাষের বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। কাজেই ফসল চাষ থেকে শুরু করে মাছ চাষ, পোল্ট্রি পালন, গবাদি পশু পালন ইত্যাদি কৃষি বিষয়ক সমস্ত কাজের তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির উৎস হিসেবে আমাদের দেশের অভিজ্ঞ কৃষকেরা যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারেন।

কৃষক বিদ্যালয়

চিত্র ১.৪.১ : কৃষক বিদ্যালয়

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কৃষক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে কৃষকরা বিভিন্ন তথ্য সেবা পেয়ে থাকেন। এই সকল বিদ্যালয়ে কৃষকদের বিভিন্ন নতুন কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া হয় যেমন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম), সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা (আইসিএম) ও সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা (আইএফএম) ইত্যাদি। এ তথ্য সমৃদ্ধ জ্ঞান তারা কৃষি কাজে সরাসরি বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দেশের ৩৩৫ টি উপজেলায় কৃষক মাঠ স্কুল স্থাপন করেছে। সারা দেশে মোট ১১ হাজার ৪৭০ টি কৃষক মাঠ স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। ২ হাজার ৫৯৭ জন কৃষক/কৃষাণীকে প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ বিদ্যালয়গুলোতে ফসলের ব্যবস্থাপনা কলা-কৌশলের উপর কৃষকদের দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য একদল

কৃষক-কৃষাণীকে অনানুষ্ঠানিকভাবে হাতে কলমে মৌসুমব্যাপী মাঠ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। একটি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ৫০ জন কৃষক-কৃষাণীকে একটি মৌসুমের পুরো সময় ধরে ২০টি অধিবেশনের মাধ্যমে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতিটি অধিবেশনের সময় ৩-৪ ঘন্টা। এর মধ্যে মহিলাদের জন্য ৪টি , পুরুষ ও মহিলাদের যৌথ ৫টি এবং কৃষকদের ১১টি অধিবেশন। প্রশিক্ষকের কাছ থেকে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করে কৃষকরা একাকী বা দলীয়ভাবে পরীক্ষা প্লট ও প্রদর্শনী স্থাপন করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এখানের শিক্ষাদান পদ্ধতি হলো- পারস্পরিক অংশগ্রহণমূলক করে শেখা, দেখে শেখা, অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে শেখা ও আবিষ্কার প্রক্রিয়ায় শেখা। এতে বয়স্ক কৃষকরাও খুব ভালোভাবে শিখতে পারেন এবং নতুন কিছু আবিষ্কার বা শেখার আনন্দে প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। তাই কৃষক মাঠ স্কুলের প্রশিক্ষণ কৃষকদের জন্য প্রায়োগিক ও বাস্তবসম্মত। ভবিষ্যতে এই প্রশিক্ষিত কৃষকদের মাধ্যমেই অন্যান্য কৃষকেরা তথ্য ও সেবা পাবে।

কৃষকসভা ও উঠোন বৈঠক

চিত্র ১.৪.২ : কৃষকসভা ও উঠোন বৈঠক

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপজেলা কৃষি অফিস প্রায় প্রতি মাসে অথবা প্রয়োজন অনুসারে মাঝে মাঝে কৃষকদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে যে সভা বা বৈঠক করে তাকে কৃষক সভা বা উঠোন বৈঠক বলে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তরে উদ্বুদ্ধ করা, কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধন দেওয়া। কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কৃষকদের সাথে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অথবা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাগণ মতবিনিময় করেন। এছাড়াও হঠাৎ কোন সমস্যা হলে যেমন ধান ক্ষেতে পোকার আক্রমণ হলে তাৎক্ষণিক ফসলের মাঠে কৃষক সভা করা হয়। মত বিনিময়ের ফলে জ্ঞান ও তথ্যে দুর্বল কৃষকের জ্ঞান বাড়ে এবং কাজে আগ্রহী হয়। এভাবে কৃষক সভা বা উঠোন বৈঠক কৃষির তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করে।

ইন্টারনেট

ইন্টারনেট হল ইলেকট্রিক যোগাযোগের মাধ্যমে যেটি অনেকগুলো কম্পিউটারকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় সংযুক্ত করে এবং তথ্যের আদান প্রদান ঘটায়। কৃষি তথ্য ও সেবা প্রাপ্তিতে ইন্টারনেটের ভূমিকা অনিস্বীকার্য। কৃষি তথ্যের বৃহৎ ভান্ডারে হচ্ছে ইন্টারনেট ওয়েবসাইট। ইন্টারনেটের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক যেকোন তথ্য সমস্যার সমাধান অনায়াসে স্বল্প সময়ে পাওয়া যায়।

ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা :

১। ভিডিও কনফারেন্সিং : ইন্টারনেট ব্যবহার করে কৃষি বিশেষজ্ঞগণ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কৃষকদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন এবং কৃষকদের সমস্যার সমাধান দিতে পারেন।

২। ই-মেইল : কৃষি বিষয়ক যেকোন তথ্য ইমেইলের মাধ্যমে একজন আরেক জনের নিকট অতি দ্রুত পাঠাতে পারে।

৩। তথ্য সরবরাহ : ইন্টারনেটের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান, তথ্য-উপাত্ত, গবেষণাপত্র সহ সর্ব প্রকার তথ্যও আদান প্রদান করা যায়।

৪। গবেষণা : কৃষিবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফলাফল এবং নিজেদের গবেষণা প্রকাশ করার জন্য ইন্টারনেটের উপর নির্ভরশীল।

৫। বাজার দর ও কেনাবেচা : বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহার বিভিন্ন কৃষি পণ্যের বাজার দর সম্পর্কে হাল নাগাদ তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া অনলাইনের কৃষি পণ্য ক্রয় বিক্রয়ও করা যায়। যাকে বর্তমানে ই-কমার্স বলা হয়।

ই-কৃষি

ই-কৃষি বলতে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে কৃষির বিভিন্ন সেবার আদান-প্রদানকে বোঝায়। বর্তমানে প্রতিটি ক্ষেত্রে ই-সেবার প্রভাব লক্ষণীয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নে ই-কৃষির বিকল্প নেই। ইতোমধ্যে কৃষিতে ইলেকট্রনিক সার্ভিস বা ই-সেবার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। কৃষি তথ্য সার্ভিসকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সরকার আধুনিক মানসম্মত আইসিটি কেন্দ্র চালু করেছে। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে (www.ais.gov.bd) কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন সমসাময়িক তথ্য সরবরাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কৃষি তথ্য সার্ভিসই প্রথম গ্রাম পর্যায়ে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন করে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের সূত্রপাত করেছে। এ কেন্দ্রগুলোতে ল্যাপটপ, ডেস্কটপ কম্পিউটার, মডেম সরবরাহ করা হয়েছে। ই-বুক তৈরির মাধ্যমে আরো সহজভাবে কৃষি তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে। টেলিভিশনের মাধ্যমে অনলাইনে সরাসরি ভিডিও চিত্র প্রদর্শনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং তথ্য প্রাপ্তির জন্য 'কিয়স্ক' তৈরি করা হচ্ছে।

টেলিভিশন ও বেতার

কৃষি তথ্য সার্ভিসের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান 'মাটি ও মানুষ' সপ্তাহে ৬ দিন সম্প্রচারিত হচ্ছে। এছাড়া জাতীয় সংবাদের সাথে বিশেষায়িত সংবাদের অংশ হিসেবে কৃষি সংবাদ প্রচারের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়। এক্ষেত্রে চ্যানেল আই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তারাই প্রথম ১৯ জানুয়ারী ২০০৮ সাল থেকে কৃষি সংবাদ প্রচার শুরু করে। এরপর ৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ থেকে বিটিভির সংবাদে এবং ৬ এপ্রিল ২০০৮ থেকে বাংলাদেশ বেতারে কৃষি সংবাদ প্রচার হচ্ছে। এছাড়াও অন্যান্য চ্যানেলগুলো এক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে।

মোবাইল ভিত্তিক কৃষি তথ্য সেবা

মোবাইল ভিত্তিক কৃষি তথ্য সেবা দেয়ার জন্য কৃষি তথ্য সার্ভিস ও প্রাকটিক্যাল একশন বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে 'কৃষি কল সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে। এই কল সেন্টার থেকে কৃষি বিশেষজ্ঞগণ সরাসরি যেকোন সমস্যার সমাধান ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এছাড়া কৃষি তথ্য সার্ভিস, এটুআই প্রকল্প এবং বাংলালিংকের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়েছে যেটি মোবাইল এসএমএস ভিত্তিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও উপজেলা ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকায় সন্নিবেশিত মৃত্তিকা উর্বরতাবিষয়ক তথ্য উপাত্ত জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজিটাল তথ্য রূপান্তর করা হয়েছে। এ তথ্য উপাত্তের উপর ভিত্তি করে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ক্যাটলিস্টের সহযোগীতায় অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সিস্টেম নামক সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। যা পরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সার্ভিস হিসেবে চালু করা হয়।

অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সার্ভিস ব্যবহারের ফলাফলঃ

ক) সারের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

খ) মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে এবং মাটির স্বাস্থ্যের উন্নয়ন হবে।

গ) ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

ঘ) মটি ও পানি দুষণ কমে যাবে।

পরিশেষে, বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ রুপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের ই-কৃষির বিকল্প নেই। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে কৃষি তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সুবিধা ব্যপক বিস্তৃতি লাভ করেছে । এ সমস্ত তথ্য ও সেবাপ্রদানকারী উৎসের মধ্যে সামগ্রিক সহযোগিতা ও সমন্বয় শক্তিশালী করতে পারলে কৃষক তথ্য ও কৃষির উন্নয়ন আরও বেগবান হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেট কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত দেখতে এবং এর সুবিধাগুলোর উপর দলগতভাবে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে।

সারাংশ

নতুন কৃষি প্রযুক্তি কৃষকের কাছে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন কৃষি তথ্যসেবা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এছাড়া কৃষক বিদ্যালয় কৃষক সভা ও উঠোন বৈঠক এর মাধ্যমে কৃষকরা নবুতন নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পারে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে কৃষকরা বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত পায় এবং তাদের কৃষি পণ্য ক্রয় বিক্রয় করার সুযোগ পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি কৃষক বিদ্যালয়ের কাজ নয়?
ক) আইপিএম প্রশিক্ষণ খ) আইসিএম প্রশিক্ষণ
গ) আইএফএম প্রশিক্ষণ ঘ) আইসিটি প্রশিক্ষণ

২। রনি তার গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের ইন্টারনেটে মাধ্যমে একজন কৃষিবিদের সাথে সরাসরি কথা বলে। যে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করছে?
ক) ই-মেইল খ) ভিডিও কনফারেন্সিং
গ) ক্ষুদে বার্তা ঘ) সবগুলো

৩। অনলাইনে কেনা বেচা প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়?
ক) ই-কমার্স খ) ই-মেইলিং
গ) ই-সেলিং ঘ) ই-বাইং

পাঠ-১.৫ বাংলাদেশের কৃষি তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির উৎস : উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কৃষি গবেষণা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন;
- কৃষি তথ্য সেবা প্রাপ্তিতে বিভিন্ন কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ইনস্টিটিউট, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান

কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে কৃষি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা যায় তাদের কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে। কৃষি উন্নয়নে কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য বেশ কয়েকটি কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে।

কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীবিভাগ

ক. স্তরভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

স্তরভিত্তিক কৃষি শিক্ষায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে ৫টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা-

(১) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, (২) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, (৩) সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, (৪) স্নাতক ডিগ্রি প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, (৫) স্নাতকোত্তর ও তদূর্ধ ডিগ্রি প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

খ. সনদ প্রদানভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

সনদ প্রদানের উপর ভিত্তি করে কৃষি প্রতিষ্ঠানসমূহকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) সার্টিফিকেট/ডিপ্লোমা সনদ প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, (২) স্নাতক ডিগ্রি প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, (৩) স্নাতকোত্তর ও তদূর্ধ ডিগ্রি প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

নিচে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি দেয়া হল:

১. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কৃষি শিক্ষা একটি বিষয় হিসাবে পাঠদান করা হয়। আমাদের দেশের সকল মাধ্যমিক স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে কৃষি শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পড়ানো হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে কৃষি বিষয়ে পৃথকভাবে সনদ দেয়া হয় না।

২. উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কৃষি শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠদান করা হয়। কৃষি শিক্ষা বিষয়টি সকল বিভাগের অর্থাৎ মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান শাখার ছাত্র-ছাত্রীরা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পড়তে পারে। বাংলাদেশের সকল উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কলেজসমূহ এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানেও কৃষি বিষয়ে আলাদাভাবে সনদ দেয়া হয় না।

৩. সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

এ ধরনের প্রতিষ্ঠান পাঠদান শেষে সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা প্রদান করে। এসব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের একাডেমিক কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণাধীন বর্তমানে সরকারিভাগে ১৬টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ২টি ভেটেনারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ২টি লাইভস্টক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কৃষিতে সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা প্রদান করে থাকে। বর্তমানে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এ ৪ বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা

কোর্স চালু করা হয়েছে। বেসরকারী পর্যায়ে ১০০টির ও বেশী কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালু আছে।

৪. স্নাতক ডিগ্রি প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

যেসব প্রতিষ্ঠান কৃষিতে স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করে তাকে স্নাতক ডিগ্রি প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে। যেমন শেখ ফজিলাতুনন্নেছা ফিসারিজ কলেজ জামালপুর।

৫. স্নাতকোত্তর ও তদুর্ধ ডিগ্রি প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

যেসব প্রতিষ্ঠান কৃষিতে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ও তদূর্ধ ডিগ্রি প্রদান করে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় বলে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বি.এস.সি, এম. এস. এবং পি. এইচ.ডি. ডিগ্রি প্রদান করে থাকে। যেমন-বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা

১. সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

ক) কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সরকারি : ১৬ টি, যথা-

নাম	অবস্থান
১. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
২. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	শিমুলতলী, গাজীপুর
৩. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	ফরিদপুর
৪. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	শেরপুর
৫. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	গাইবান্ধা
৬. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	তাজহাট, রংপুর
৭. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	ঈশ্বরদী, পাবনা
৮. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	দৌলতপুর, খুলনা
৯. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	রহমতপুর, বরিশাল
১০. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	খাদিমনগর, সিলেট
১১. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
১২. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
১৩. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	ঝিনাইদহ
১৪. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	আড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ
১৫. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	হোমনা, কুমিল্লা
১৬. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	রাঙ্গামাটি

খ. লাইভস্টোক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট : ২টি যথা- (১) লাইভস্টোক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাইবান্ধা, (২) লাইভস্টোক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সিলেট।

গ. ভেটেরিনারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট : ২টি যথা-

(১) ভেটেরিনারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ (২) ভেটেরিনারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, আলমডাঙ্গা, কুষ্টিয়া।

২. স্নাতক ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (কলেজ)

১. শেখ ফজিলাতুন্নেছা ফিসারিজ কলেজ, জামালপুর।

৩. স্নাতকোত্তর ও তদূর্ধ ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (বিশ্ববিদ্যালয়)

১. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর,
৩. হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর
৪. শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৫. পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী
৬. চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী ও এনিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
৭. সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

উপরোল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আরও বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোতে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠদান পূর্বক ডিগ্রি প্রদান করা হয়। নিচে এরকম কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের তালিকা দেয়া হল-

১. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৩. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
৪. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
৫. খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)

বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ ও প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৩ সালের ১৮ আগস্ট জাতীয় শিক্ষা কমিশন, খাদ্য ও কৃষি কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ঘোষিত হয় "পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ"। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী ১৯৬১ শিক্ষা বর্ষে স্থাপিত হয় পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ বিশ্ববিদ্যালয় নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রাখা হয়। ময়মনসিংহ শহর থেকে ৪ কিলোমিটার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর পশ্চিম তীরে এক মনোরম পরিবেশে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান।

চিত্র ১.৫.১ : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্যাবলী

মূলদায়িত্ব

স্নাতক, মাস্টার্স ও পি.এইচ.ডি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা। বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষকদের মাঝে সু-সংযোগ স্থাপন করা।

অন্যান্য কাজ

কৃষি উন্নয়নে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা। বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেয়া।

গবেষণা

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল প্রকার গবেষণা, ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান বাউরেস (বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেম) এর মাধ্যম পরিচালিত হয়। নিরলস গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গত ৪০ বছরে যেসব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে।

১. উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত : বাউ ৬৩, বাউ ১৬;
২. সয়াবীনের জাত সোহাগ, জি-২;
৩. সরিষার জাত সম্পদ, সম্বল;
৪. জীবানু সার;

৫. কলা উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি
৬. সয়েল টেস্টিং কিট;
৭. ধান ক্ষেতে মাছ চাষ প্রযুক্তি;
৮. কৃত্রিম পশু প্রজনন প্রযুক্তি;
৯. সার ছিটানো যন্ত্র
১০. গরু মোটা তাজা করণ প্রযুক্তি
১১. ভাসমান খাচায় মাছ চাষ প্রযুক্তি
১২. কুলের জাত: বাউকুল-১; বাউকুল-২; বাউকুল-৩;

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ব শে মু র কৃ বি)

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের আর্থ সামাজি উন্নয়ন মূলত কৃষি উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। কৃষিখাতে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনের জন্য উচ্চতর কৃষিজ্ঞান ও সঠিক প্রযুক্তি দরকার। এই বাস্তবকে সামনে রেখে ১৯৯৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। গাজীপুর জেলার সালনা নামক স্থানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান।

চিত্র ১.৫.২ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ব শে মু র কৃ বি)

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলী : মুলকাজ স্নাতক, মাস্টার্স ও পিএইচডি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

অন্যান্য কাজের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি তথ্য কৃষক ও ব্যবহারির কাছে হস্তান্তর করা।

গবেষণা

কৃষি শিক্ষাকে ফলপ্রসূ ও অর্থবহ করে তুলতে গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। অব্যাহত গবেষণার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় সূচনালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে।

১. বারমাসী সাদা ও বারমাসী বেগুনি নামে শিমের দুটি জাত উদ্ভাবন করেছে, যা সারা বছর চাষ করা যায়।
২. মটরশুটির তিনটি অত্যাধুনিক জাত যা কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।
৩. ইপসা নামে পেয়ারার একটি বারমাসী জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।
৪. ঢেড়শের ভাইরাস প্রতিরোধী জাত, পেঁয়াজের দুটি উচ্চফলনশীল জাত, চীনা বাধাকপির জাত, বারমাসী টমেটোর জাত, স্বল্প মেয়াদী উচ্চ ফলনশীল মুগডালের জাত ইত্যাদি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
৫. পেঁপের পুরুষ ও স্ত্রী উভয় গাছেই ফুল ও ফল হয় এমন জাত (গাইনোডাইয়োসিয়াস জাত) মাটি ও গাছের অভ্যন্তর হতে উপকারী ব্যাকটেরিয়া শনাক্তকরণ ও অণুজীব সার হিসেবে এর ব্যবহার বিষয়ক গবেষণা। কৃষি গবেষণা ও কৃষি তথ্য সেবায় বিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অভিজ্ঞ কৃষিবিদ ও মানসম্পন্ন কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশকে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

কৃষি গবেষণা কি?

গবেষণা হচ্ছে নতুন জ্ঞান উন্নয়নের চাবিকাঠি এবং গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানের উন্মেষ ঘটানো। গবেষণা শব্দটির মুল ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে "Research" সাধারণভাবে গবেষণা বলতে অজানা কোন কিছুকে অনুসন্ধান করে জানা বা স্পষ্ট ধারণা লাভ করাকে গবেষণা বলে। কৃষি গবেষণা বলতে বুঝায় কৃষি বিষয়ক কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়কে বৈজ্ঞানিক ও ক্রমানুযায়ী অনুসন্ধান করে তথ্য উদঘাটন করাকে কৃষি গবেষণা বলে। অর্থাৎ কৃষি সংক্রান্ত নানা বিষয়াদি নিয়ে গবেষণা করাকে কৃষি গবেষণা বলে।

কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান :

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির সার্বিক উন্নয়নকে নিমিত্তে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য কৃষি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশের কৃষিগবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছে।

১. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর
২. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর
৩. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ঢাকা
৪. বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ
৫. বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী
৬. বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা
৭. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, সিলেট
৮. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম
৯. বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার
১০. পশু চিকিৎসা গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১১. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ
১২. বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ইনস্টিটিউট, রাজশাহী
১৩. মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৭৬ সালের ৪ঠা আগস্ট তারিখে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর প্রধান কার্যাবলী গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী ও উদ্দেশ্য নিচে দেওয়া হল :

১. ফসলের নতুন জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়ন এবং উদ্ভাবিত জাতসমূহ চাষাবাদের জন্য অনুমোদনের ব্যবস্থা করা।
২. ফসল উৎপাদনের জন্য আধুনিক কলাকৌশল উদ্ভাবন করা।
৩. চাহিদা অনুযায়ী দেশে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।
৪. কৃষি উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের সেমিনার, সিম্পোজিয়াম কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন করা।
৫. উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রদর্শনের জন্য মাঠ দিবসের আয়োজন করা।
৬. বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগবালাই থেকে ফসল রক্ষার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।
৭. ফসলের উপর বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্বন্ধে পুস্তিকা, পোস্টার লিফলেট তৈরি করা এবং প্রচার করা।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিউট ১৯৭০ সালের ১লা অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে অবস্থিত। এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী নিচে দেওয়া হল:

১. ধানের নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা।
২. বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে ধান ফসলকে রক্ষার কৌশল সহনশীল জাত উদ্ভাবন করা।

৩. বিভিন্ন ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের হাত থেকে ধান ফসলকে রক্ষা করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।
৪. আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা এবং জাত ও কলাকৌশলের তথ্য বিনিময় করা।
৫. ধান চাষের সঙ্গে সম্পর্কিত পুস্তিকা, বই প্রকাশ, পোষ্টার লিফলেট তৈরি করা ও কৃষকের মাঝে বিতরণ করা।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

১৯৭৩ সালের ৫ই এপ্রিল ঢাকার ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় কৃষি গবেষণাকে জোরদার করা এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কর্মসূচী প্রণয়ন ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করে থাকে। নিচে এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী দেওয়া হল :

১. কৃষিক্ষেত্রে বিদেশী সহায়তার ব্যবহার সম্পর্কে ও গবেষণা পরিচালনার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা।
২. নতুন গবেষণা ইনস্টিটিউট, গবেষণা কেন্দ্র, তথ্য কেন্দ্র, জার্ম প্লাজম সেন্টার, যাদুঘর, হারবেরিয়াম, গ্রন্থাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।
৩. এনএ আর এস ভুক্ত ইনস্টিটিউটসমূহের গৃহীত ও সম্পাদিত কার্যক্রম একট বিশেষজ্ঞ প্যানেল দ্বারা মূল্যায়ন করা।
৪. কৃষি বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন সেমিনার সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং স্বায়ত্বশাসিত। নিচে এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী দেওয়া হল:

১. পরমাণু শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নতমানের অধিক ফলনশীল ধান, পাট, ডাল, তেলবীজ, সবজি জাতীয় শস্যের জাত উদ্ভাবন করা।
২. উদ্ভাবিত জাতসমূহের কৃষি তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো।
৩. বিভিন্ন ফসলের জন্য সার সুপারিশমালা প্রণয়ন, বোরাগ ও পোকামাকড় দমনের পদ্ধতি সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করা।
৪. মাটির ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যাবলী নিরূপণ, আর্থ-সামাজিক গবেষণা ও উন্নত প্রযুক্তি কৃষকের নিকট হস্তান্তর করা।
৫. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা ও একে অপরের সম্পূরক হিসেবে কাজ করা।

কৃষি গবেষণার গুরুত্ব

প্রকৃতিকে গভীরভাবে বুঝবার ও এর রহস্যকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টাকেও সহজ ভাষায় বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। এ প্রচেষ্টাকে ব্যাপক ও সুষ্ঠভাবে রূপ দিতে গিয়েই গবেষণার প্রচলন হয়েছে। গবেষণার ব্যাপকতা বর্তমান পৃথিবীর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। গবেষণার পরিধি শুধু বস্তু জগতেই সীমাবদ্ধ নেই, জীবজগত, ভাবজগত এবং সামাজিক জীবনও এর উর্বর ক্ষেত্র হয়ে পড়েছে। মূলত: এসব গবেষণালব্ধ ব্যপ্তি ও সমষ্টি জীবনে রূপায়িত করেই বিভিন্ন দেশ উন্নতি করে চলছে। তাই যে দেশ গবেষণায় যত বেশি অগ্রসর সে দেশ ততই উন্নত। অপরদিকে অনুন্নত দেশের একটাই লক্ষণ হল গবেণার প্রতি অবহেলা। উদারহরণস্বরূপ জাপান স্বাধীনতা লাভের পর সে দেশটিতে তখন দারুন খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। সে দেশের মানুষ তখন গাছের লতা পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করেছিল। পরবর্তীতে তারা গবেষণা শুরু করল কিভাবে গাছের লতাপাতা ও ক্ষুদ্র অনুজীবকে কাজে লাগিয়ে মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটানো যায়। তারা কৃষি গবেষণার মাধ্যমে আজ বিশ্বের বুকে উন্নত দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

আমাদের দেশে ক্রমেই জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। কিন্তু আবাদী জমির পরিমাণ দারুণভাবে হ্রাস পাচ্ছে। অধিকন্তু রাসায়নিক পদার্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহারে ইতোমধ্যে মৃত্তিকা সম্পদ ও পরিবেশে যোগ হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষতিকর প্রভাব বাড়ছে প্রাকৃতিক দূর্যোগজনিত ফসলহানির ঝুঁকির। তদুপরি এই ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটাতে আমাদের ফসলের উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করতে হবে। তাই উন্নত দেশগুলোর সাথে যেতে হলে আমাদের কৃষি গবেষণার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষনা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে খোঁজ করে তাদের চলমান গবেষণার উপর একটি প্রতিবেশন তৈরি করবে।

সারাংশ

কৃষি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটগুলো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি করছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক কৃষি বিজ্ঞানী তৈরি করছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নকে তরান্বিত করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি গবেষণায় ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেঁপের একটি নতুন জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। এটির বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-
i) পুরুষ ও স্ত্রী উভয় গাছে ফুল ও ফল হয় ii) ফলন কম হয়
iii) গাছ তাড়াতাড়ি মরে যায়
ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি কোথায়?
ক) রাজশাহী খ) ঈশ্বরদী
গ) সিলেট ঘ) গাজীপুর

৩। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান
ক) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
খ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
গ) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিউটট
ঘ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিউট

৪। বাংলাদেশে কৃষি গবেষণার ১৯৭৬ সালে গাজীপুরে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে কৃষি বিষয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে।
উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে?
ক) BRRI খ) BARI
গ) BADC ঘ) DAE

৫। ড. হাসান ময়মনসিংহে অবস্থিত ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি কৃষি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী। তিনি সেখানে গবেষণা করে ধানের কয়েকটি নতুন জাত উদ্ভাবনে ভূমিকা রেখেছেন। উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে।
ক) BINA খ) BARI
গ) BRRI ঘ) BADC

পাঠ-১.৬ কৃষি তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির উৎস : তথ্য সার্ভিস, কৃষি সম্প্রসারণ, এনজিও এবং কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষি তথ্য সার্ভিস কি তা বলতে ও লিখতে পারবেন;
- কৃষি সম্প্রসারণ কি তা বলতে ও লিখতে পারবেন;
- কৃষি সম্প্রসারনের উদ্দেশ্য তুলে ধরতে পারবেন;
- কৃষি সম্প্রসারণের প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কৃষি তথ্য সার্ভিস, সম্প্রসারণ, উপকরণ, প্রতিষ্ঠান এনজিও, এ আই সি সি

কৃষি তথ্য সার্ভিস (Agricultural Information Service)

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। ১৯৬১ সনে কৃষি তথ্য সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর ১৯৮০ সনে কৃষি তথ্য সংস্থাকে কৃষি তথ্য সার্ভিস নামকরণ করা হয়। সংস্থাটি জন্মলগ্ন থেকে নিরলসভাবে গণমাধ্যমের সাহায্যে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি তৃণমুল পর্যন্ত দ্রুত বিস্তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তর খামারবাড়ি, ফামগেট ঢাকায় অবস্থিত। মাঠ পর্যায়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর ও বরিশালসহ মোট এগারটি আঞ্চলিক কার্যালয় ও কক্সবাজারে দুটি লিয়াজোঁ অফিস রয়েছে। (তথ্যসূত্র: কৃষি তথ্য সার্ভিস)

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত আধুনিক লাগসই কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি সহজ সরল ও সাবলীলভাবে অভীষ্ট দলের কাছে বোধগম্য আকারে পোঁছানোর ব্যবস্থা করা কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান লক্ষ্য। (তথ্যসূত্র: কৃষি তথ্য সার্ভিস)

কৃষি সম্প্রসারণ

কৃষি সম্প্রসারণ একটি ফলিত কৃষি বিজ্ঞান। কৃষি জ্ঞান ও কৃষি গবেষণা থেকে এর জ্ঞান আহরিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ মূলত: নতুন জ্ঞানের বিস্তৃতি। এটি এক দিকে কৃষকদের সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী সরবরাহ করে ও তাদের প্রয়োগ করতে সাহায্য করে। অন্য দিকে এটা কৃষকদের সমসস্যাবলী সংগ্রহ করে সমাধানের জন্য গবেষণাগারে প্রেরণ করে। এজন্য এটাকে দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া বলা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ (১৯৮৫) কৃষি সম্প্রসারণের সংজ্ঞায় বলেছেন, কৃষি সম্পসারণ একটি প্রক্রিয়া বা সেবা যা শিক্ষা পদ্ধতি মাধ্যমে কৃষকদের খামার পদ্ধতি ও প্রয়োগ কৌশলের উন্নয়নসহ উৎপাদন ক্ষমতা ও আয় বৃদ্ধি ও সহায়তা করে এবং পরিশেষে পল্লী জনগণের জীবন মান উন্নয়নে সহায়তা দান করে। কৃষি সম্প্রসারণের লক্ষ্য হচ্ছে কৃষকদের উৎপাদন সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা সমস্যার বিশ্লেষণে তাদেরকে সাহায্য করা, কি উপায়ে সমস্যার সমাধান করা যায় তা শিক্ষা দেয়া এবং কৃষকদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা যাতে তারা দক্ষতার সাথে কৃষিকাজ করে তাদের আয় বাড়াতে পারে।

কৃষি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য

কৃষি সম্প্রসারণের এমন কিছু উদ্দেশ্য থাকে যাতে কৃষকের শিক্ষা দীক্ষা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা এনে দেয়ার পূর্ণ স্বীকৃতি থাকে। তবে বিশেষ করে সম্প্রসারণ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য স্থির করে। এই শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে কৃষকদের জ্ঞানে,

দক্ষতায়, মনোভাবে এবং কর্মে পরিবর্তন এনে দেয়া। কৃষি সম্প্রসারণের নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যাবলী গৃহীত হয়েছে।

- কৃষকদের কৃষি উৎপাদন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদেরকে গবেষণালব্ধ আধুনিক কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান দান করা।
- প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- কৃষক পরিবারের সকল সদস্যের উপযুক্ত কৃষি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- স্থানীয় নেতৃবৃন্দের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের স্বাবলম্বী করে তোলা।
- বিভিন্ন অধিদপ্তর হতে প্রাপ্য তথ্য কৃষকদের সরবরাহ করা এবং কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা গবেষণাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান

যে সকল প্রতিষ্ঠান কৃষির প্রযুক্তিসমূহ কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে কাজ করে এবং কৃষকদের যথাযথভাবে প্রযুক্তিব্যবহারে সাহায্যে করে এবং কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যাবলী সমাধানের জন্য গবেষণাগারে প্রেরণ করে সেগুলোকে কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান বলে। কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে-

১. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
২. প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর
৩. মৎস্য অধিদপ্তর
৪. পাট অধিদপ্তর
৫. তুলা উন্নয়ন বোর্ড
৬. বন অধিদপ্তর

নিম্নে কয়েকটি প্রধান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচিতি দেয়া হলো:

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অধিদপ্তর। এ অধিদপ্তরের অধীনে ৯টি উইং রয়েছে। উইংসমূহ হচ্ছে- (১) প্রশাসন এবং পার্সোনেল উইং, (২) সরেজমিন উইং, (৩) খাদ্যশস্য উইং (৪) অর্থকরী ফসল উইং (৫) উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, (৬) প্রশিক্ষণ উইং, (৭) পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং, (৮) পানি ব্যবস্থাপনা ও (৯) কৃষি প্রকৌশল উইং

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণার ফলাফলসমূহ কৃষকদের নিকট পৌঁছে দেয়া।
- আধুনিক কৃষি কলাকৌশল ও উৎপাদন প্রযুক্তি গ্রহণে কৃষকদের উৎসাহিত ও সাহায্য করা।
- কৃষকদের চাহিদা, সম্পদ ও সামর্থ অনুযায়ী সর্বোচ্চ উৎপাদন লাভে সহায়তা করা।
- কৃষি উপকরণসমুহের সুষ্ঠুভাবে এবং যথাসময়ে কৃষকদের কাছে সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রাখা।
- কৃষি অফিসারগণের চাকরীকালীন প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা।
- কৃষি সংক্রান্ত জরুরী বার্তা ও তথ্য সামগ্রী যেমন পোষ্টার, লিফলেট, পুস্তিকা যথাসময়ে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা।
- কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা।
- কৃষি সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

কৃষি উন্নয়নে কৃষি সম্প্রসারণের প্রয়োজনীতা

কৃষি উন্নয়ন বলতে কৃষির পুরাতন ও অনুন্নত প্রযুক্তির পরিবর্তন ঘটিয়ে অধিক উৎপাদনক্ষম আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারকে বুঝায়। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকদের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করে হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন করে অধিক ডিম, মাংস ও দুধ উৎপাদন সম্ভব। উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহারে একক ফসলের পরিবর্তে বহুমুখী ফসল, নতুন ফসলের প্রবর্তন, নতুন খামার পদ্ধতি, সঠিক মাত্রায় সার ও কীটনাশক প্রয়োগ,

নতুন জাত এবং আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদি পশু, হাস-মুরগী ও মাছের চাষাবাদ ইত্যাদি কৃষি উন্নয়নের প্রথম ধাপ। নিচে কৃষি উন্নয়নে কৃষি সম্প্রসারণের প্রয়োজনীতা বর্ণনা করা হল।

১. প্রযুক্তি শিক্ষায় কৃষি সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে সব প্রযুক্তি কৃষি গবেষণা থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ সেগুলো কৃষকদের হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে থাকে। গাছের বৃদ্ধি ও উন্নয়নে জৈব পদার্থের ভূমিকা ও জৈব সারের ব্যবহারের ফলে কি পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, খাদ্য হিসেবে সারের প্রয়োজনীয়তা, কোন সময়ে কোন সার প্রয়োগ করতে হয় কোন ফসলে কোন সার কি মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়, কোন প্রকার খামার পদ্ধতি অনুসরণ করা বেশি লাভজনক হবে, কোন জাতের কোন ফসল কোন সময়ে চাষ করতে হবে, কোন সময়ে কোন ফসলে পোকার আক্রমণ বেশি, কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পোকার আক্রমণ থেকে ফসলকে রক্ষা করা যাবে ইত্যাদি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মীরা কৃষকদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সম্প্রসারণের এই শিক্ষার ফলে কৃষকদের কৃষি জ্ঞান উন্নত হয় এবং আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণে তারা আরও আগ্রহশীল হয়।

২. কৃষি উপকরণের জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা

কৃষি উপকরণের ব্যবহার হচ্ছে কৃষি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম ধাপ। কিন্তু সেই উপকরণগুলোর প্রতি আগ্রহ বা জনপ্রিয়তা না থাকলে সেগুলো তারা ব্যবহার করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে না। তাই সম্প্রসারণের দায়িত্ব হচ্ছে কৃষি উপকরণগুলোর জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করা। এর ফলে বীজ, সার, কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক, সেচ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনের উকরণগুলোর ব্যবহার কৃষকসমাজে দিন দিন বেড়েই চলেছে। কৃষি সম্প্রসারনের শিক্ষামূলক প্রচারের মাধ্যমে কৃষকদের দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে এবং উপকরণগুলোর জনপ্রিয়তা বহুগুণে বেড়েছে।

৩. প্রযুক্তি বিস্তারে কৃষি সম্পসারণের প্রয়োজনীতা

কৃষি সম্প্রসারণ কৃষি প্রযুক্তি শিক্ষা দেওয়াসহ কৃষক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রযুক্তির পূর্ণ বিস্তার ঘটিয়ে থাকে। সম্প্রসারণ কর্মীরা প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদেরকে এমনভাবে জ্ঞানদান করে যাতে তারা প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো ভালোভাবে বিবেচনা করে ব্যবহারের বা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে কৃষি গবেষণা হতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো দ্রুত বিস্তার ঘটে চলেছে। আধুনিক ধানের জাত লাইন পদ্ধতিতে চাষ, প্রত্যেক ফসলে সুষম সার ব্যবহার ইত্যাদি প্রযুক্তির বিস্তার সম্প্রসারণের শিক্ষার ফলে ঘটে থাকে।

৪. স্থানীয় সম্পদ পূর্ণ ব্যবহারে কৃষি সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা

কৃষি সম্প্রসারণ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের নিজের যে সম্পদ আছে বা উপকরণ আছে তারই সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেয়। কৃষকগণ নিজের সম্পদ ব্যবহার করে অনেক ভাবে লাভবান হতে পারে। কৃষি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষকদের গোবর সংরক্ষণ ও ব্যবহার, কম্পোষ্ট তৈরি ও ব্যবহার, নিজস্ব কৃষি যন্ত্রপাতির উন্নয়ন সাধন, পশু সম্পদের উন্নয়ন, স্থানীয় পদ্ধতিতে পোকামাকড় দমন, জমির উর্বরতার জন্য জৈব সারের ব্যবহার ইত্যাদি স্থানীয় সম্পদ পূর্ণ ব্যবহারে শিক্ষা দিয়ে থাকে।

৫. স্থানীয় নেতৃত্বের উন্নয়নে কৃষি সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা

কৃষি সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয় নেতৃত্বের উন্নয়ন ঘটে থাকে। স্থানীয় নেতারা যাতে কৃষি ও অন্যান্য সমস্যা কৃষি সম্পসারণের নজরে আনতে পারে এ জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

বেসরকারী সংস্থা বা এনজিও (NGO)

সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় কিন্তু সরকারের উন্নয়ন নীতিমালা অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও বলে। মূলত গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক ও মহিলাদের নানামুখী কল্যান সাধন করাই এনজিও গুলোর উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে অনেক এনজিও কাজ করে এবং এরা কৃষকদের তথ্য ও সেবা প্রদান করে কৃষি উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখছে।

বাংলাদেশে কৃষি নিয়ে কাজ করে এমন কিছু এনজিও হল টি এম এস এস (TMSS), ব্র্যাক (BRAC), আরডিআরএস (RDRS) প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক, কারিতাস, কেয়ার, ভোসড ইত্যাদি।

এনজিওর কার্যক্রম

বাংলাদেশে এনজিওগুলো কৃষি বিষয়ক নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে-

১। কৃষকদের কৃষি উপকরণ ও কৃষি ঋণ সরবরাহ করে।
২। কৃষকদের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।
৩। কৃষি সমস্যার সমাধান দেয়।
৪। উন্নত প্রযুক্তি সরবরাহ করে।
৫। উচ্চফলনশীল জাতের ফসল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে।
৬। কৃষি বিষয়ক তথ্য সরবরাহ করে।
৭। সেচ কার্যক্রমে সহায়তা করে।
৮। বীজ ও চারা উৎপাদন করে কৃষকদের সরবরাহ করে।
৯। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য আপদকালীন সময়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদান করে।

কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান

যে সকল উপকরণ বা দ্রবাদি কৃষি উৎপাদনের প্রয়োজন হয় তাদেরকে কৃষি উপকরণ বলে। যেমন-বীজ, কীটনাশক, সার, কৃষিজ যন্ত্রপাতি, হাঁস-মুরগির খাদ্য, মাছের সম্পূরক খাদ্য, ইত্যাদি। এসব উপকরণ ব্যবসায়িক লাভের উদ্দেশ্য বাজারজাত করা সহ এসব কৃষি উপকরণ বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করে থাকে। এসব উপকরণ উৎপাদনের ধরণ ও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন বীজ কৃষকদের দিয়ে উৎপাদন করা হয়। হাইব্রিড বীজ বিদেশ থেকে আমদানি করে সরবরাহ করা হয় অথবা নিজস্ব খামারে বর্ধন করে। আবার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি কারখানা স্থাপন করে উৎপাদন করা হয়। জৈব সার দেশেই উৎপাদন করে সরবরাহ করে, রাসায়নিক সারের মধ্যে ইউরিয়া, টিএসপি ও গন্ধক সার দেশে উৎপাদন করে এবং অন্যান্য রাসায়নিক সার আমদানি করা হয়। কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষকের কাছে উপকরণ সরবরাহ করে ও নতুন উপকরণ ও তথ্য দিয়ে কৃষকদের সেবা করে থাকে।

কিছু উল্লেখযোগ্য কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হলো:

বীজ উৎপাদন ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান	কীটনাশক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান	সার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	পদ্মা অয়েল কোম্পানি লি:	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ড্রাষ্টিজ কর্পোরেশন
কৃষিবিদ ফার্ম লি:	এসিআই লি:	(বিসিআইসি)
এগ্রিবিজনেস কর্পোরেশন	স্কয়ার	বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন
আফতার বহুমূখী ফার্ম লি:	আলফা এগ্রো লি:	
মল্লিকা সীড কোম্পানি	জেনিটিকা	মেসার্স নোয়াপাড়া ট্রেডার্স
গেটকো সীড কোম্পানি	এগ্রোকোর	মের্সাস শেখ ব্রাদার্স
হার্ডস ফাম	নোকন লি:	নাফকো (প্রা:) লি:
কৃষাণ সীড ইন্টারন্যাশনাল	প্রাইম এগ্রো লি:	হানিবী (প্রা) লি:
সুপ্রীম সীড কোম্পানি লি:	মার্প বাংলাদেশ	সুরমা ফার্টিলাইজার
এসিআই সীড	অটোক্রপ	শারীর ট্রেড সংস্থা লি:
প্রিমিয়াম সীড লি:	বেক্সিমকো	মেঘনা ফার্টিলাইজার
ব্র্যাক সীড	সেতু কর্পোরেশন লি	যমুনা এগ্রো কেমিক্যাল
নর্থ সাউথ সীড লি:	মার্শাল	
ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার হাইব্রিড সীডস লি:	বায়ার ক্রপসায়েন্স	
ইস্ট বেঙ্গল সীড কোম্পানি	এফএমসিআই লি:	

শিক্ষার্থীর কাজ	কৃষি তথ্য ও সেব্য প্রদানের কৃষি সম্প্রসারণের ভূমিকা আলোচনা করবে এবং একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে।

সারাংশ

কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম কৃষকদের কৃষি বিষয়ক শিক্ষা দেয় এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষকদের প্রয়োজনীয় সকল কৃষি উপকরণ সরবরাহে মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন তরান্বিত করছে। এছাড়াও কৃষক তথা কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন এনজিও এর অবদান ও যথেষ্ট।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরেরর অধীনে কতটি উইং আছে?
ক) ৮টি খ) ৯টি
গ) ১০টি ঘ) ৭টি।

২। কৃষি সম্প্রসারণের শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নয় কোনটি?
ক) জ্ঞান দান করা খ) দক্ষতা বৃদ্ধি করা
গ) আর্থিক সহায়তা দেয়া ঘ) কোনটিই নয়।

৩। কৃষি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য কোনটি?
ক) আধুনিক কলাকৌশল সমূহকে জ্ঞান দান করা
খ) কৃষকদের স্বাবলম্বী করে তোলা
গ) পরিবারের সকল সদস্যদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা
ঘ) উপরের সবগুলো।

৪। কৃষি সম্প্রসারণ কোন ধরনের প্রক্রিয়া
ক) এক পাক্ষিক খ) বহুপাক্ষিক
গ) দ্বি-পাক্ষিক ঘ) সবগুলো।

৫। কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
ক) সিলেট খ) ঢাকা
গ) বরিশাল ঘ) খুলনা

৬। হাসান গ্রামের একজন যুবক। সে গ্রামের কৃষকদের কাছে বিভিন্ন কৃষি উপকরন পৌঁছে দেয়ার কাজে নিয়োজিত। নিচের কোনটি কৃষি উপকরন নয়?
ক) সার খ) হাঁস মুরগীর জন্য খাদ্য
গ) বীজ ঘ) টেলিভিশন

পাঠ-১.৭ ব্যাবহারিক : বিভিন্ন প্রকার খামার পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ডেইরি খামারের উপাদানগুলো জানতে পারবেন;
- ডেইরি খামার সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করবেন;
- পোল্ট্রি খামারের বিস্তারিত বর্ণনা করতে পারবেন;
- পোল্ট্রি খামার সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।

(ক) বাণিজ্যিক ডেইরি (গবাদি পশু) খামার পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন।

মূলতত্ত্ব: যে খামারে গাভী পালন করে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন করা হয় তাকে ডেইরি খামার বলে। বাণিজ্যিক ডেইরি খামারগুলো লোকালয় থেকে দুরে উঁচু স্থানে স্থাপন করতে হবে। খামারের বিদ্যুৎ ও অন্যান্য ব্যবস্থা পর্যাপ্ত হতে হবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাজারজাতকরনের সুবিধা থাকতে হবে। খামারে অবশ্যই উন্নত জাতের ও অধিক দুধ উৎপাদনশীল গাভী পালন করতে হবে।

চিত্র ১.৭ .১ : ডেইরি খামার

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

১। একটি বাণিজ্যিক ডেইরি খামার
২। খাতা-কলম

কাজের ধারা:

১। একটি বাণিজ্যিক ডেইরি খামারের মালিক অথবা কর্তব্যরত ম্যানেজারের সাথে পরিদর্শনের অনুমতি ও সময়সূচী নির্ধারণ করুন।
২। ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা বেশি হলে ১০-১২ জনের দলে বিভক্ত করুন এবং প্রতিদিন একটি দল পরিদর্শন করুন।
৩। খামার মালিকের নিকট থেকে খামারের ব্যয় জেনে নিন এবং খাতায় লিপিবদ্ধ করুন।
৪। খামারের অবস্থান এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন রাস্তাঘাট, বিদ্যুত ও পানি সরবরাহ বাজারজাতকরণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে খাতায় লিখুন।
৫। খামারের স্থান, বিভিন্ন ঘরের আয়তন জেনে খাতায় লিপিবদ্ধ করুন।
৬। খামারের গাভী, বকনা, বাছুরের সংখ্যা ও অবস্থা পর্যবেক্ষন করে খাতায় লিখুন।
৭। গাভীর সরবরাহকৃত খাবার, খাবারের মান খাবার প্রদানের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষন করে খাতায় লিখুন।
৮। গাভীর রোগব্যাধী, আক্রান্ত গাভীর সংখ্যা, টিকা প্রদান, চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় জেনে এবং পর্যবেক্ষন করে খাতায় লিখুন।
৯। খামারের কর্মরত ম্যানেজার ও অন্যান্য শ্রমিকদের কাজের তালিকা তৈরী করুন।
১০। খামারের উৎপাদন, দৈনন্দিন খরচ, মাসিক নিট লাভ, ইত্যাদি সম্পর্কে জেনে খাতায় নোট করুন।
১১। পরিশেষে, সকল তথ্য ধারাবাহিকভাকে লিখে একটি প্রতিবেদন তৈরী করুন।

পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ছক:

গবাদিপশুর বিরবণ	খামারের বিবরণ	পরিচর্যা	খাবারের আয় ব্যয়
গাভীর ঘরের অবস্থান: গাভীর জাত: গাভীর সংখ্যা: (বেকনা, বাছুর ও গর্ভবতী গাভী):	খামারের নাম: খামারের ঠিকানা: খামারের উদ্দেশ্য: খামার প্রতিষ্ঠার সন ও তারিখ: খামারের অবস্থান: খামারের আয়তন: খামারে কী কী ঘর আছে	গাভীর খাদ্য: রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা:	প্রতিদিন দুধের গড় উৎপাদন: প্রতিদিন উৎপাদন দুধের মূল্য: খামারের স্থায়ী ব্যয়: খামারের মাসিক নিট আয়: খামারের বাৎসরিক নিট আয়: খামারের বর্তমান অসুবিধাসমূহ - ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মন্তব্য:

তারিখ:
প্রতিবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা:
স্বাক্ষর:

সতর্কতা

১। খামারের গাভীকে বিরক্ত করা যাবে না।
২। খামারের মালিক বা ম্যানেজারের অনুমতি ছাড়া কোন জিনিসে হাত দিবেন না।
৩। সকল তথ্য অবশ্যই খাতায় লিখতে হবে।

(খ) পোল্ট্রি খামার পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন:

মূলতত্ত্ব: বাণিজ্যিকভাবে স্থাপিত পোল্ট্রি খামারে ব্রয়লার বা লেয়ার মুরগি পালন করা হয়। মুরগীর বিশুদ্ধ বা খাঁটি জাত যেমন প্লাইমউথ, রক, নিউ হ্যাম্পশায়ার ইত্যাদি মাংস উৎপাদনকারী মুরগীর মধ্যে প্রজনন করে ব্রয়লার স্ট্রেইন এবং হোয়াইট লেগহর্ণ, ফাউমি ইত্যাদি ডিম উৎপাদনকারী মুরগীর মধ্যে প্রজনন করিয়ে লেয়ার স্ট্রেইন তৈরি করা হয়। কাজেই এদের মাংস ও ডিম উৎপাদন ক্ষমতা বিশুদ্ধ বা খাঁটি জাতের চেয়ে অনেক বেশি হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

১। একটি ব্রয়লার বা লেয়ার খামার।
২। খাতা-কলম

কাজের ধারা:

১. একটি বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামারের মালিক অথবা কর্তব্যরত ম্যানেজারের সাথে পরিদর্শনের অনুমতি ও সময়সূচী নির্ধারণ করুন।
২. ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বেশি হলে ১০-১২ জনের দলে বিভক্ত করুন এবং প্রতিদিন একটি দল পরিদর্শন করুন।
৩. খামারীর অবস্থান, ভৌত অবকাঠামো ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে খাতায় লিখুন।
৪. খামারটির ম্যানেজার ও শ্রমিকের কার্যাবলি সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে খাতায় লিখুন।

৫. খামার মালিক বা ম্যানেজারের সাথে আলোচনা করে খামারে মুরগীর জাত, সংখ্যা বয়স ও পালন ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে জেনে নিন।
৬. ব্রয়লার খামারের ক্ষেত্রে কত বয়সে এবং কত ওজন হলে বিক্রি করতে হবে তা জেনে নিন।
৭. লেয়ার খামারের ক্ষেত্রে কত মাস বয়সে মুরগী ডিম দেয় এবং ডিম উৎপাদনের সংখ্যা ও হার জেনে নিন।
৮. খামারের মুরগীর টিকা প্রদান পদ্ধতি ও রোগ দমন ব্যবস্থা সম্বন্ধে জেনে নিন।
৯. খামারের আয় ব্যয় সম্পর্কে জেনে নিন।
১০. খামারের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জেনে নিন।
১১. খামারের ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
১২. পরিশেষে সমস্ত বিষয় ধারাবাহিকভাবে লিখে একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন।

পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ছকঃ

পোল্ট্রির বিবরণ	খামারের বিবরণ	পরিচর্যা	আয় ব্যয়
মুরগীর জাত: মুরগীর সংখ্যা: খামারে ডিম উৎপাদনের হার:	খামারের নাম: খামারের ঠিকানা: খামারের উদ্দেশ্য: খামার প্রতিষ্ঠার সন ও তারিখ: খামারের অবস্থান: খামারে বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ: মুরগীর ঘরের আয়তন:	খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থ: রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা:	খামারে দৈনিক আবর্তক বা অস্থায়ী ব্যয়: খামারে দৈনিক আয়: মাসিক নিট আয়: খামারে বর্তমান সমস্যসমূহ: মন্তব্য:

তারিখ:
প্রতিবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা:
স্বাক্ষর:

সতর্কতা

১. পরিদর্শনকালে খামারের মালিক বা ম্যানেজারের অনুমতি ছাড়া কোন জিনিসে হাত দিবেন না।
২. খামারের মুরগীকে উত্যক্ত করবেন না।
৩. খামারের প্রতিটি বিষয় ভালভাবে খেয়াল করে খাতায় লিপিবদ্ধ করুন।

পাঠ-১.৮ ব্যবহারিক: নিকটবর্তী একটি কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মুল উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাজ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন;
- উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

মূলতত্ত্ব : কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন ধরনের কৃষি প্রযুক্তি এবং এর যাবতীয় তথ্যাবলি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

উপকরণ: প্রতিষ্ঠানের তালিকা (ঠিকানাসহ): নোট বুক, পেন্সিল, কলম, পরিদর্শন সময়সূচী, যানবাহন, প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম।

কাজের ধারা:

১। বাংলাদেশে অবস্থিত কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের খোঁজ খবর নিন।

২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করুন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর পরিদর্শনের অনুমতি চেয়ে নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে চিঠি লিখুন।

৩। যাতায়াতের জন্য যানবাহন নির্ধারণ করুন।

৪। নিধারিত দিনে যথাসময়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানে মনোনিত ব্যক্তির সাথে দেখা করুন।

৫। প্রতিষ্ঠান প্রধানের মনোনিত ব্যক্তির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করুন এবং নোট বুকে লিপিবদ্ধ করুন।

৬। পরিদর্শন শেষে নিজ প্রতিষ্ঠানে ফিরে এসে সংগ্রহীত তথ্য শিক্ষকের সহযোগীতায় বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন।

সতকর্তা:

১। যথাসময়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যেতে হবে।

২। কোন প্রযুক্তি কিংবা গবেষণার উপাদানে হাত দেয়া যাবে না।

কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবেদন-এর একটি নমুনা ছক নিচে দেয়া হলো:

১। পরিদর্শনের তারিখ:

২। পরিদর্শনকারীর দল নং:

৩। পরিদর্শনকারীর নাম:

৪। দলীয় সদস্য সংখ্যা:

৫। পরিদর্শনকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম:

৬। গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান:

৭। প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ও পদবী:

৮। প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকাল:

৯। মোট বিজ্ঞানীদের সংখ্যা:

১০। মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা

১১। এ পর্যন্ত ডিগ্রি প্রাপ্তদের সংখ্যা

(ক) স্নাতক/স্নাতোকোত্তর

(খ) পিএইচডি

১২। গ্রন্থাগার:

(ক) বিদেশী বই এর সংখ্যা

(খ) দেশী বই এর সংখ্যা

(গ) জার্নালের সংখ্যা

১৩. গবেষণাগারের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

১৪। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের তালিকা:

১৫। প্রতিষ্ঠানের বিভাগসমূহের নাম:

১৬। এ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় বর্তমান কী কী কৃষি সম্প্রসারণ ও গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী চালু আছে।

১৭। প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম:

১৮। প্রতিষ্ঠানের সমস্যা

১৯। সুপারিশ:

২০। মন্তব্য:

তারিখ:

প্রতিবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা:

স্বাক্ষর:

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মনির দিনাজপুরের একজন কৃষক। তার দুই হেক্টর জমি আছে। তিনি বিভিন্ন ঋতুতে তার কিছু জমিতে ধান, কিছু জমিতে গম এবং অন্যান্য শাক সবজি জাতীয় ফসল চাষ করেন। কৃষি কাজ করেই তিনি পরিবার চালান এবং মোটামুটি সচ্ছল জীবন যাপন করেন।

ক) ফসল কী? ১

খ) মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসল সম্পর্কে লিখুন। ২

গ) মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কী কী বিষয় জড়িত তুলনামুলক আলোচনা করুন। ৩

ঘ) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। ৪

২। রাকিব ও তার বন্ধুরা কিছুদিন আগে কলেজ থেকে বাণিজ্যিক ডেইরি খামার, মৎস্য খামার ও পোল্ট্রি খামার পরিদর্শনে যায়। বিভিন্ন খামারের বিস্তারিত জেনে তারাও একটি খামার দেয়ার পরিকল্পনা করে এবং প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা করে। এক বছর পর তারা তাদের খামার দেয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষে পরামর্শের জন্য একজন কৃষিবিদের কাছে যায়।

ক) পোল্ট্রি কাকে বলে? ১

খ) হাওর ও বাওর বলতে কী বোঝায়? ২

গ) যদি রাকিব ও তার বন্ধুরা একটি ডেইরি খামার দেয় তবে তারা কোন কোন উৎস থেকে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। ৩

ঘ) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পারিবারিক ও জাতীয় জীবনে মৎস্য উৎপাদনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১ : ১। খ ২। গ ৩। খ ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২ : ১। খ ২। ক ৩। খ ৪। গ ৫। খ ৬। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩ : ১। গ ২। ক ৩। গ ৪। গ ৫। ঘ ৬। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪ : ১। ঘ ২। খ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। খ ৫। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬ : ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। গ ৫। খ ৬। ঘ